আধুনিক সমাজে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের স্থান।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গ-সাহিত্য ও বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সকল আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে দেখা যায় যে, চিন্তাশীল ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন সমাজনেতৃগণের মধ্যে অনেকেই বলিতেছেন যে, বাঙ্গালী কিছু অধিকমাত্রায় সুকুমার সাহিত্য ও ললিতকলার চর্চ্চা করিয়াছে; এখন কিছুদিন কাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীতের চর্চ্চা বন্ধ রাখিয়া ইতিহাস, বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক শিল্পের চর্চ্চা করিলেই দেশের ও সমাজের কল্যাণ। সাধারণ বাঙ্গালীসমাজের মধ্যে, বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সমাজনেতৃগণের এই কথায় যে অল্পাধিকপরিমাণে সায় দিতেছেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। শিল্প ও সাহিত্য এখন ক্রমশঃই একপ্রকার সৌখীন চিত্তবিলাসের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা ক্রমশঃই অস্বীকৃত হইতেছে। যে কারণেই হউক, সাধারণ বাঙ্গালীর মধ্যে সুকুমার শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রতিপত্তি যে অনেকপরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে এই যে অবস্থাটা দাড়াইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচনার যোগ্য। কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশে নয়, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে সর্ব্বত্রই এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—জাতীয় জীবনে সুকুমার সাহিত্য ও শিল্পের স্থান আছে কি না, ও যদি থাকে ত সে কোথায়? এটি কেবল বাঙ্গালী-জীবনের বিশেষ সমস্যা নয়, এটি বর্ত্তমান যুগের সমস্যা; বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম যেখানে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে, আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল সেই ইউরোপে এই বিশেষ সমস্যাটি বেশ স্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। সেখানে দেখিতে পাই যে, যদিও সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ নিজেদের বৃত্তি সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, যদিও তাঁহারা সমাজনেতা, সমাজ-শিক্ষক ও বর্ত্তমানকালোপযোগী যুগধর্ম্মের পুরোহিত বলিয়াই পরিচিত হইতে চাহেন, তথাপি ইউরোপীয় জনসাধারণেরমধ্যে উচ্চ অঙ্গের শিল্প ও সাহিত্যের প্রসার প্রতিপত্তি খুবই

করিতে একরূপ অসমর্থ।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, অবস্থাটা অস্বাভাবিক। এতা
ধরিয়া সভ্য মানব-সমাজমাত্রই যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কা
আসিয়াছে, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে
মানবসমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্য প্রাত্যহিক জীবনের নিত্য স
ছিল। সামাজিক জীবনের উপর কাব্য চিত্র সঙ্গীতের প্রভাব প্রবলভ
কাজ করিত। সামাজিক জীবনে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠাকার্য্যে শিল্প
সাহিত্যই প্রধান সহায় ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন গ্রীস, মধ্যযুগের ই
রোপ এবং বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবার পূ
কালীন ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের উল্লেখ করা যাইতে পারে
প্রাচীন গ্রীসে, ভাস্কর্য্যশিল্প, নাট্যাভিনয় ও সঙ্গীত আদর্শ পৌরচরি
গঠনের প্রধান উপাদানস্বরূপ বিবেচিত হইত। বর্ত্তমান ইংলণ্ডে
এক জন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক ডিকিন্সন সাহেব (G. Lowes Dickinson
তাঁহার প্রণীত Greek View of Life নামক গ্রন্থে গ্রীকদিগে
সঙ্গীতচর্চ্চা প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার এই বিশেষত্বটুকু লক্ষ্য কা
যাছেন। গ্রীকরা চরিত্র-গঠনের দিক দিয়া সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুশীল
করিতেন। বিভিন্ন প্রকার সুর ও Mode অর্থাৎ রাগরাগি
শ্রোতার মনে কিরূপ বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদ্রেক করে ও শ্রোতা
চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, তাঁহারা সে দিকে বিশে
লক্ষ্য রাখিতেন। এমন কি, প্লেটো তাঁহার রিপাব্লিক (Republic
গ্রন্থে লিখিতেছেন যে, আদর্শ পৌরচরিত্র গঠন করিতে হইলে পৌরগণে
সুসঙ্গত ও বিধিবদ্ধ সঙ্গীত শুনাইতে হইবে ; কারণ, উচ্ছৃঙ্খল সঙ্গীতে
দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রেরই সৃষ্টি হয়, এবং রাজ্যমধ্যে অরাজকতার প্রাদু
র্ভাব হয়। ডিকিন্সন সাহেব বলেন যে, আধুনিক ইউরোপীয়ের নিক
প্রাচীন গ্রীক-জীবনের এই দিকটা দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকার মত বোধ হয়
কারণ, বর্ত্তমান কালে ইউরোপীয় জনসাধারণের মধ্যে যে সঙ্গীতের অধিক
মাত্রায় প্রচলন, তাহা অধিকাংশ লোকের নিকট শ্রবণেন্দ্রিয়ের একপ্রকা
বিলাসমাত্র। ইউরোপের মধ্যযুগে কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রাদির দ্বারা
এক দিকে খ্রীষ্টধর্ম্ম, অন্য দিকে বীরধর্ম্ম বা Chivalry সমাজের মধ্যে

প্রসার লাভ করিয়াছিল। সাধু-মহাপুরুষ-অবতারদিগের লীলাচিত্রশোভিত গির্জ্জাঘর ও মঠ, ধর্ম্মকথা-সংবলিত মিষ্টিরী (Mystery) ও মিরাকল (Miracle) নাট্যাভিনয়, সাধুসন্তদিগের চরিত্র, বাইবেল-বর্ণিত ঘটনাবলী ও খ্রীষ্টলীলা-সংবলিত কাব্যসমূহের পাঠ, আবৃত্তি ও কীর্ত্তন, ক্যাথলিক ধর্ম্মপন্থার নানা পর্ব্ব ও উৎসব—এই সকলের দ্বারা ইউরোপের মধ্যযুগে সাধারণ জনসমাজের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম যে জীবনীশক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই। অন্য দিকে সেই যুদ্ধবিগ্রহ-অশান্তির যুগে যোদ্ধ্বর্গের মধ্যে নানা রোম্যান্স কাব্যের মধ্য দিয়া আর একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এক কথায় তাহার নাম দেওয়া হয় Chivalry বা বীরধর্ম্ম। যুদ্ধে ন্যায়-ধর্ম্ম-পালন, সবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলের উদ্ধার, স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান ও জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনা —এইরূপ কয়েকটি আদর্শ লইয়া এই রোম্যান্স সাহিত্যের সৃষ্টি। এই সকল আদর্শ কেবল কাব্য ও সঙ্গীতের রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল না, সেকালের যোদ্ধসমাজের জীবনেও এই আদর্শগুলি অল্পাধিকপরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্যদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত শিল্প ও সাহিত্য সামাজিক জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশে যাত্রা, কথকতা, পাঠ, আবৃত্তি, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি নানা উপায়ে সাহিত্যের আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, চণ্ডী, মনসার ভাসান প্রভৃতি গ্রন্থের আদর্শই আমাদের সমাজে গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শস্বরূপ স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। অন্য দিকে চিত্র ভাস্কর্য্য স্থাপত্য প্রভৃতি কলাশিল্পও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। মন্দিরাদির গাত্রে দেবদেবী ও অবতারের লীলাচিত্র ও রামায়ণ মহাভারত পুরাণোক্ত কাহিনী এবং বৌদ্ধবিহারাদিতে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও লীলাচিত্র ভারতসমাজের সর্ব্বোচ্চ আদর্শগুলিকে লোক-চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা জীবন্ত করিয়া রাখিত। আদর্শপুত্র, আদর্শ পত্নী, আদর্শ ভ্রাতা, আদর্শ পরিবার, আদর্শ রাজা, আদর্শ ক্ষত্রিয়, আদর্শ বণিক্, আদর্শ ভৃত্য, আদর্শগৃহী, আদর্শ ত্যাগী ও ভক্ত ;—সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমস্ত আদর্শ- গুলিই সাহিত্য ও শিল্পের

সাহায্যেই সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ভারতীয় রাজদরবারে কবি, শিল্পী, পুরাণপাঠক ও সঙ্গীতাচার্য্যদিগের স্থান সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিতেছেন, তন্মধ্যে অমাত্য-সভাগঠন-প্রসঙ্গে ব্যবস্থা দিতেছেন যে, রাজার অমাত্য-সভায় ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শূদ্র অমাত্যের পার্শ্বে এক জন করিয়া সূত বা পুরাণপাঠককে স্থান দিতে হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন সভ্যসমাজমাত্রেই শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ব্যক্তিগত ও সামাজিক চরিত্রের গঠনে নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে, এবং সমাজনেতৃগণ এইগুলিকে সমাজ-ব্যবস্থার সুপরিচালন কার্য্যে প্রধান সহায়স্বরূপ অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে আধুনিক পাশ্চাত্যসভ্যতা যেখানেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, সেইখানেই ইহাদিগকে আর সেরূপ সহায় মনে করা হয় না। যাঁহারা সমাজের মধ্যে সংসারের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত আছেন, যাঁহারা বিশেষভাবে সাহিত্য-রসচর্চ্চায় নিযুক্ত নহেন, এক কথায় সমাজের বার আনা লোকের কাছে সাহিত্য ও শিল্পের এই যে প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহার কারণ কি? এরূপ বলা যায় না যে, সাহিত্য ও শিল্প-সৃষ্টির অভাবই ইহার কারণ। এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগে সপ্তাহে সপ্তাহে কত শত শত কাব্য উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্য-সম্ভার বহন করিয়া গ্রন্থপ্রকাশকগণ জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে-ছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিভাবান্ দৈবশক্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার ও শিল্পীর যে অসদ্ভাব আছে, তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশের মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, আধুনিক ইউরোপের গেটে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, শেলী, ব্রাউনিং, বার্ণ জোন্স, রোদ্যাঁ প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ যে কোনও যুগের সাহিত্য ও শিল্পদরবারে উচ্চাসন পাইবার যোগ্য।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসঙ্গে যাঁহারা এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার-হীনতার মোটা-মুটি এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, অধিকাংশ বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অধিকাংশ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, এবং কি ভাবে, কি ভাষায় ইংরাজী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

সুতরাং তাঁহাদের এই "ইংরাজী-গন্ধী" সাহিত্য সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট হয় একেবারে দুর্ব্বোধ্য, অথবা বোধগম্য হইলেও তেমন প্রাণস্পর্শী হয় না। কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য নিহিত আছে, কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। কারণ, শুধু যে বাঙ্গালাদেশেই সাহিত্য ও শিল্প সামাজিক হিসাবে পঙ্গু ও শক্তিহীন হইয়াছে, তাহা নহে, আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকেও এই ব্যাধি প্রবলভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং ব্যাধির মূল নিরূপণ করিতে হইলে সাহিত্যের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র ছাড়িয়া বর্ত্তমান যুগের জীবন-যাত্রা-প্রণালীর যে বিশেষ ধর্ম্ম, তাহার মধ্যেই ইহার সন্ধান করিতে হইবে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে যাহারা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, এটি বিশেষভাবে ব্যবসা-দারীর যুগ। এ পর্য্যন্ত যে সকল নানা বিচিত্র মানব-সম্বন্ধ ব্যাবহারিক জীবনের শুষ্কতা অপহরণ করিয়া নানা অসুবিধা সত্ত্বেও সামাজিক জীবনে রস সঞ্চার করিত, বর্ত্তমানকালে সেই সকল সম্বন্ধ ক্রমশঃই অস্বীকৃত হই-তেছে, এবং আইন আদালত, চুক্তি ও ব্যবসাদারী তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। রাজার সহিত প্রজা, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, প্রভুর সহিত ভৃত্য, বণিকের সহিত গৃহস্থ, স্বজাতীয়ের সহিত স্বজাতীয়, গ্রামবাসীর সহিত গ্রামবাসী, এমন কি, এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি এখন আর সেরূপ পরস্পর আত্মীয়-সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, ক্রমশঃ কেবল চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হইতেছেন। বৈষয়িক সম্বন্ধমাত্রই এখন পূরাপূরি বৈষয়িক, তাহার সহিত ধর্ম্ম বা অন্য কোন প্রকার স্বাভাবিক ভাববন্ধনের সংস্রব নাই। কাহারও সম্বন্ধে কাহারও দায়িত্ববোধ নাই, সমাজের ব্যক্তি-মাত্রই এখন এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। যে দায়িত্ব আইন আদালতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, সে দায়িত্ব ভিন্ন অন্য প্রকার দায়িত্ব এখন আর সেরূপ স্বীকৃত হয় না। এই বাঙ্গালাদেশে প্রাচীন সমাজে দেখা যায় যে, সরকারের বিশেষ বিধিব্যবস্থা ব্যতিরেকেও বৃক্ষজলাশয়দেবালয়-প্রতিষ্ঠা, পাঠশালা-চতুষ্পাঠী পরিচালন, অন্নসত্র জলসত্র স্থাপন, দরিদ্র আতুরদিগের ভরণপোষণ, এমন কি অক্ষম বা ব্যাধিগ্রস্ত গোপশ্বাদির চিকিৎসা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজ-হিতকর নানা অনুষ্ঠান অতি সুচারুরূপে ও স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন হইত। এখন অইন আদালত সমেত সরকারের সমস্ত

শক্তি নিয়োজিত না হইলে সামাজিক কোনও অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় না। একটা ছোট কথা দিয়াই ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে সকলেই অল্পাধিকপরিমাণে ভুক্তভোগী যে, এই সভ্যতার যুগে সাধারণ লোকের পক্ষে উপযুক্ত মূল্য দিয়াও আহার্য্যই হউক আর পরিধেয়ই হউক, খাঁটী বা আসল দ্রব্য পাওয়া ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। অথচ এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ আধুনিক; মিউনিসিপালিটির আইনের কোনই কড়াকড়ি ছিল না, অথচ প্রাচীন সমাজে খাঁটী দ্রব্যের অভাব ঘটিত না। কারণ সমাজের মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের সামাজিক ধর্ম্মবোধ জাগ্রত ছিল—বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যেও সেই ধর্ম্মবোধ বা ভাবপ্রবণতা সমানভাবেই কার্য করিত। বণিক্ কখনও নিজকে সমাজ হইতে বিশ্লিষ্ট, সকলসম্বন্ধমুক্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে ভাবিতে পারিতেন না। সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে ধর্ম্মের অবতার ছিলেন, এ কথা কেহই বলিবেন না, কিন্তু সমাজের মধ্যে যে সকল আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমাজের সেই জীবন্ত জাগ্রত অবস্থায় কোনও ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেই সমাজধর্ম্ম লঙ্ঘন অপেক্ষা পালনই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। আমরা এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগে এই সমাজানুগত্যকে দাসত্ব বলিতে শিখিয়াছি ও নানাপ্রকার আন্দোলন ও বিপ্লবের দ্বারা সমাজের নানা বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া, মজ্জাগত সমাজবোধের যে সংস্কার এখনও ক্ষীণভাবে লোকের মনে জাগিয়া আছে, তাহা নানা যুক্তি ও প্রলোভনের দ্বারা উৎপাটিত করিয়া সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমানকালের সভ্য মানব-সমাজ ক্রমশঃ যে আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তাহাতে সমাজ বলিলে আমরা এ দেশে যাহা বুঝি, সে বস্তুর কোনও স্থান নাই। রাষ্ট্রশক্তিই এখন যথাসম্ভব সমাজধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতেছে।

শক্তি রাষ্ট্রেরই হউক বা ব্যক্তিবিশেষেরই হউক, তাহার ধর্ম্মই এই যে, তাহার সহিত ভাবের কোনও সংস্রব নাই। যেখানে কেবল শক্তি দ্বারা কাজ চালান হয়, সেখানে ভাব জাগাইয়া রাখার কোনও আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। সকলেই জানেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশে ষ্টেট্ অর্থাৎ রাজ-সরকারকে দরিদ্রের ভরণপোষণের ভার লইতে হইয়াছে।

তজ্জন্য সরকারের আইন অনুসারে প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে একটি নির্দ্দিষ্ট কর আদায় করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কোনও গৃহস্থের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করা সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, দরিদ্রের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণা ও সমবেদনার ভাব, তাহা থাকুক আর নাই থাকুক, প্রত্যেক গৃহস্থকে রাজশক্তির তাড়নে এই দরিদ্র-পোষণের জন্য অর্থব্যয় করিতে হয়। ফলে যে পরিমাণে এই দরিদ্রভরণের দায়িত্ব গৃহস্থের স্কন্ধ হইতে অপসারিত হইয়া রাজশক্তির উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সেই পরিমাণে গৃহস্থের অন্তঃকরণে দুঃস্থলোকের প্রতি যে স্বাভাবিক করুণার ভাব ছিল, তাহা চর্চ্চার অভাবে ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। এইরূপ সামাজিক সর্ব্ববিধ কার্য্যের মধ্যে যে পরিমাণে যন্ত্রশক্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, যে পরিমাণে কলের নিয়মে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক জীবনে ভাব বা ধর্ম্মবোধের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে।

অথচ এই ভাব লইয়াই শিল্প ও সাহিত্যের কারবার। বাস্তব জগতের মধ্যে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠা, কাজের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠা, ইহাই শিল্প ও সাহিত্যের কার্য্য। সুতরাং যে সমাজে ভাবের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের শক্তি ও প্রসার যে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? যে সাহিত্য ও শিল্প সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য্য অঙ্গ-স্বরূপ বিবেচিত হইত, এখন তাহা সামাজিক হিসাবে অনাবশ্যক অথবা সৌখীনতা ও বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই যন্ত্রশক্তির যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের কোনও উপযোগিতা আছে কি না? যদি কলেই সব কাজ সুসম্পন্ন হয়, সে রাজশক্তি-পরিচালিত আইনের কলই হউক, আর বাষ্পশক্তি-পরিচালিত কারখানার কলই হউক,—কলেই যদি সব কাজ সুনিয়মে ও সুব্যবস্থায় সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সমাজের মধ্যে অনিশ্চিত ও অনির্দ্দিষ্টরূপে পরিব্যাপ্ত ভাবপ্রবণতা ও ধর্ম্মবোধের উপর নির্ভর করিয়া থাকার আবশ্যকতা কি? সাহিত্য ও শিল্পকে এখন সমাজের কার্য্য হইতে অবসর দিলে ক্ষতি কি? তাহাতে সমাজেরও ক্ষতি নাই, বরং শিল্প ও সাহিত্য স্বাধীনতা লাভ

করিয়া অভিনবভাবে নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিবে। শিল্পসাহিত্যের সহিত সমাজের এই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদে শিল্পসাহিত্যের কোনও ক্ষতি আছে কি না, তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন প্রথমে দেখা যাউক, ইহাতে সমাজের কোনও ক্ষতি আছে কি না। ইতিপূর্ব্বে আধুনিক সমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, রাজশক্তি যে পরিমাণে সামাজিক কার্য্য-পরিচালনের ভার গ্রহণ করিয়াছে, সেই পরিমাণে সমাজের মধ্য হইতে স্বাভাবিক ভাবগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে। এই ভাব-দারিদ্র্য ও ধর্ম্মহীনতা কখনই কোনও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। ভাব লইয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ভাবের অসদ্ভাবে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ কোথায়? এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন (এবং পাশ্চাত্য সভ্যসমাজে ইহা শতাধিকবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হইয়াছে) যে, কি সমাজ-ব্যবস্থায় কি জড় জগতে যন্ত্রশক্তি যতই কার্য্যকুশল ও সুনিয়ন্ত্রিত হউক তাহা কখনই সম্পূর্ণভাবে মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্মবুদ্ধি, সৌন্দর্য্যবোধ বা ভাব-প্রবণতার স্থান পূরণ করিতে পারে না। মানুষের স্বার্থপরতা ও ভোগবাসনাকে ধর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া যথেচ্ছভাবে একবার কাজ করিতে দিলে তাহাকে আবার আইনের কল দিয়া বাঁধিয়া ব্যবস্থা রক্ষা করা যে কত কঠিন, পাশ্চাত্য জগতের সমাজনেতৃগণ ও শাসকবৃন্দ তাহা এখন বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। ধনীর সহিত নির্ধনের দ্বন্দ্ব, ক্রেতার সহিত বিক্রেতার দ্বন্দ্ব, ব্যবসায়ীর সহিত ব্যবসায়ীর দ্বন্দ্ব, দেশের সহিত দেশের দ্বন্দ্ব —পাশ্চাত্য জগতের এই দ্বন্দ্বপ্রতিদ্বন্দ্বের অগ্নি সমস্ত পৃথিবী ছাইয়া ফেলিতেছে, এবং সমাজব্যবস্থাপকদিগের নিকট সমস্যার পর সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। এ দিকে পারিবারিক ও সামাজিক ভাবগ্রন্থি শিথিল হওয়ায় পরিবার ও সমাজের অনেক কার্য্যের ভার এখন ষ্টেটকে লইতে হইয়াছে। বয়ঃস্থ ও অক্ষম আত্মীয় কুটুম্বের, এমন কি, পিতামাতার প্রতি যে স্বাভাবিক ভক্তি, শ্রদ্ধা বা প্রীতির ভাব, তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং রাজ-সরকার হইতে Old Age Pensions Act পাশ করিয়া তাহাদিগের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে। শ্রমজীবী মজুরের সহিত কারখানার মালিকের ঠিকাচুক্তির বন্ধন ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই, সুতরাং বাণিজ্যব্যাপারের সামান্য পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শ্রমজীবী

কাজ না পাইয়া জীবিকাহীন হইয়া পড়ে। শেষে ষ্টেট হইতে ইনসিউরান্স আইন (Insurance Act) পাশ করিয়া তাহাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হয়; ষ্টেট হইতে Minimum Wages Act পাশ করিয়া ন্যায্য মজুরীর হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হয়। এমন কি, যে দাম্পত্য সম্বন্ধ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ, তাহাও শিথিল হইতে শিথিলতর হইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পাশ্চাত্যজগতের নারীসমাজ এখন পুরুষ হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনীতিক ভোটের অধিকার, এমন কি, মাতৃত্ব ও সন্তানপালন প্রভৃতি গৃহস্থালীর কাজকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং সমাজের ছোট বড় যাবতীয় কর্ম্ম ক্রমশঃ ষ্টেটের স্কন্ধে ন্যস্ত হওয়ায়, ব্যবস্থাপক-দিগের দায়িত্বভার অসম্ভব রকম বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে, নূতন নূতন বিপদ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা আসিয়া সমাজকে অনবরত শঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, এবং আইনের পর আইন পাশ করিয়া সেই সকল সমস্যার আপাততরমা সমাধান করা হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অনেকে এই নূতন নূতন আইন পাশ করাকেই উন্নতির লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লন। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, আইন-যন্ত্রের এই অতিরিক্ত পরিচালন, সমাজশরীরে এই অহরহঃ ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রচালনা, সমাজের ব্যাধিরই পরিচয়, উন্নতির নহে। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের মধ্যে অনেকেই এ কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, সমাজের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমাজশরীরে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার করিতে হইবে।

সুতরাং সমাজের দিক দিয়া দেখা গেল যে, শিল্প-সাহিত্যের সহিত সমাজের সম্বন্ধচ্ছেদ সমাজের পক্ষে কখনই কল্যাণকর নহে। এখন দেখা যাউক, এই সম্পর্কচ্ছেদে সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি আছে কি না। প্রশ্নটি গুরুতর, এবং এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে ইহার সম্যক্ ও বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর নহে। তথাপি মোটামোটি ভাবে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য ও শিল্পের যে বিশেষ প্রকৃতি, প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের সহিত তুলনায় তাহার আলোচনা করিলে এই লাভ ক্ষতি হিসাবের দিকে কিছু দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, যে ভাবরস ও সৌন্দর্য্য-বোধ শিল্প-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ, তাহা এখন সমাজ অর্থাৎ লোক-সমষ্টির জীবন হইতে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। সাহিত্য

ও শিল্প এখন তাই সমষ্টিকে ছাড়িয়া, সমাজকে ছাড়িয়া এক একটি স্বতন্ত্র মানবকে অবলম্বন করিয়াছে। কারণ, ভাবপ্রবণতা ও সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; তাহা যদিও সমাজ হইতে ক্রমশঃ বিতাড়িত হইয়াছে, তথাপি এখনও তাহা অনেক স্বতন্ত্র মানুষের অন্তঃকরণে জাগিয়া আছে। তাই আজকাল, ব্যষ্টিভাবে এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনে যে সকল ভাব ফুটিয়া উঠে, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের মনশ্চক্ষে সৌন্দর্য্যের যে যে বিশেষ মূর্ত্তি প্রকটিত হয়, এক একটি স্বতন্ত্র মানবের চরিত্র জীবনের নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিকশিত হয়, সেই বিচিত্র মানব-কাহিনীই আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের উপকরণ। সাহিত্যের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে বিশেষভাবে ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ লীরিক্ (lyric) বা গীতিকাব্য ও ব্যক্তিগত চরিত্রবিশ্লেষণপূর্ণ উপন্যাসের যুগ বলা যাইতে পারে। কাব্য-চিত্র-সঙ্গীত প্রভৃতি কলাশিল্প এখন সমাজের সিংহাসন হইতে স্থানচ্যুত হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির নিভৃত অন্তরের কোণে আশ্রয় লইয়া চারি দিকের শুষ্কতা ও শ্রীহীনতার মধ্যেও কোনরূপে প্রাণধারণ করিতেছে। কবি, শিল্পী বা কাব্যরসিক কোনরূপে সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া অবসরকালে একটি কাল্পনিক সৌন্দর্য্য-জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়া কাব্য ও কলাশিল্পের রসাস্বাদন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক জি. কে. চেষ্টারটন্ (G. K Chesterton) কীট্স্ প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের কবিদিগের উল্লেখ করিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন—"It was an age of inspired office-boys"—সাহিত্যের ইতিহাসে এটা দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত আফিসের কেরাণীর যুগ। অর্থাৎ, কবি ও শিল্পী এখন সমস্ত দিন ধরিয়া আধুনিক আফিসের শুষ্কতার মধ্যে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া দিয়া অবসরকালে আপন আপন নির্জ্জন কামরায় বসিয়া কল্পনার সাহায্যে এক দিব্য-সৌন্দর্য্যজগৎ রচনা পূর্ব্বক কাব্য বা শিল্প চর্চ্চা করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় যে বিশেষ ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, তাহাকে "ব্যক্তিগত শিল্প-সাহিত্য" এবং প্রাচীন ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যকে "সামাজিকশিল্প-সাহিত্য" আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দিক হইতে এই দুই ছাঁচের শিল্প-সাহিত্যের তুলনা করিলে ইহাদিগের বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা হইতে পারে।

প্রথমে ভাবের দিক দিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল ভাব অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কাব্যচিত্রাদি রচিত হইত, তাহা সমাজের

সাধারণ জন-মণ্ডলীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল। প্রাচীনকালের সামাজিক আদর্শের সহিত এই সকল ভাবের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। সে কালে সমাজের ক্ষেত্র হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে সকল বড় বড় ভাব ও আদর্শ উদ্ভূত হইত, শিল্প ও সাহিত্য তাহারই সেবায় নিযুক্ত ছিল। লোক-সমষ্টির হৃদয়ে সেই সকল ভাব সহজেই সহানুভূতি লাভ করিত, এবং এই জন্যই তাহাদের প্রেরণাশক্তিও ব্যক্তিগত ভাবোচ্ছ্বাস অপেক্ষা সমধিক প্রবল ছিল। সহজে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিত বলিয়া শিল্পিগণের ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীও অপেক্ষাকৃত সরল, অনাড়ম্বর ও নিঃসঙ্কোচ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে শিল্পী স্বীয় রচনামধ্যে যে সকল ভাবের অবতারণা করেন, তাহা সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যক্তিগত না হইয়া পারে না। তাহা সাধারণতঃ ভাবুকহৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরের কথা, নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক সমভাবাপন্ন ভাবুক ও কাব্যরসিক ব্যক্তির চিত্তেই তাহা প্রসারলাভ করিতে পারে। এমন অবস্থায় শিল্প-রচনার মধ্যে স্বভাবতঃই একটা সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়ে। শিল্পীর মনে এখন সর্ব্বদাই এই সন্দেহ জাগিয়া থাকে যে, হয় ত তাঁহার অন্তরের গভীর ভাবগুলি অধিকাংশ লোকের নিকট সহানুভূতি পাইবে না; সেই জন্য তাঁহাদের রচনায় হয় ভাবপ্রকাশের জটিলতা, না হয় একটা বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। সহজ সরল ভঙ্গীতে ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এখন তাই অধিকাংশ শিল্পীর অনায়ত্ত। প্রাচীন সাহিত্যে গভীর ও নিবিড় ভাবের অভাবই যে সেই সাহিত্যের সরলতার কারণ, তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব মহাজনদিগের পদাবলী, পারস্য দেশের সুফী কাব্য ও সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য্য, প্রাচীন চীনের প্রাকৃতিক চিত্র, ইউরোপের মধ্যযুগের ম্যাডোন্না চিত্রগুলি, আধুনিক শিল্প ও সাহিত্যের অপেক্ষা যে ভাবের গভীরতার হিসাবে ন্যূন, তাহা অবশ্য কেহই বলিবেন না। তথাপি এই সকল প্রাচীন কাব্য চিত্রাদি সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য ছিল, এবং আপামরসাধারণের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত। আধুনিক কবি ও শিল্পীদিগের রচনা কিন্তু কখনও অধ্যয়ন-কক্ষ ও আর্টগ্যালারীর বাহিরে জীবনের ক্ষেত্রে নামিতে পারে না। ইহার একটা কারণ এই যে, প্রাচীন কালে ভাব সাধন বলিয়া একটি বস্তু ছিল, এখন তাহার একান্ত অসদ্ভাব। চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, এঞ্জেলিকোর (Fra Angelico) রচনা কেবল ক্ষণিক ভাবের উচ্ছ্বাসমাত্র নহে। তাঁহারা যে কয়টি ভাব অবলম্বন করিয়া শিল্প রচনা করিতেন, তাহা সংখ্যায়

অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। কিন্তু সেই কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট ভাব তাঁহারা জীবনব্যাপিনী সাধনায় পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যেমন এক দিকে শিল্পী, তেমনই অপর দিকে ভাবসাধক। সেই জন্য তাঁহাদের ভাব বস্তু-তন্ত্র ও শক্তিশালী হইত। তাঁহারা নিজেদের সাধনার ধন শিল্পের সাহায্যে সমাজের সাধারণ সম্পত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরুষপরম্পরাক্রমে একই ভাবের সাধনার দ্বারা যে সঞ্চিত-শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই কেবল বাস্তব সংসারে অতীন্দ্রিয় ভাবপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ। স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ্ লেথাবী (W. R. Lethaby) তাঁহার প্রণীত Architecture নামক গ্রন্থে এক স্থলে লিখিতেছেন যে, যে শিল্প কেবল ব্যক্তিবিশেষের কল্পনা-শক্তি হইতে উদ্ভূত না হইয়া সহস্র-শিল্পীর সাধনার ফলস্বরূপ (The Art which is not one man deep, but a thousand men deep) তাহাই মহৎ শিল্প বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। আধুনিক শিল্প-সাহিত্যে যে সকল ভাবের অবতারণা হয়, তাহা সংখ্যায় অসীম ও অনির্দ্দিষ্ট। ব্যক্তিবিশেষের মনে বিভিন্ন বিভিন্ন অবস্থায় যে সকল বিচিত্র ভাবের স্পন্দন অনুভূত হয়, তাহা যতই সূক্ষ্ম ও অসাধারণ হউক না, সমস্তই এখন শিল্পের বিষয়ীভূত। ভাব এখন সাধনার বস্তু নয়, সেই জন্য প্রত্যহ অভিনব ভাব ও অভিনব মানসিক অবস্থার চিত্রণেই শিল্পী নিযুক্ত। নূতনত্বের সন্ধান, পুরাতন ভাবের সাধনার স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই জন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, এই সকল সাময়িক ও অস্থায়িভাব শিল্পী বা শিল্পামোদীর জীবনে সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। শিল্প-সাহিত্য এখন মানুষের মনোরাজ্যের প্রচ্ছন্ন কোণসমূহে নূতন নূতন প্রদেশ আবিষ্কার-কার্য্যে নিয়োজিত, এখনও কোথাও ঘরবাড়ী বাঁধিবার কোনও উদ্যম নাই। ফলে আধুনিক শিল্প বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু ভাবের গভীরতা ও বস্তু-তন্ত্রতার হিসাবে প্রাচীন-শিল্পের তুলনায় দীন ও শক্তিহীন হইয়া রহিয়াছে।

ভাবের সম্বন্ধে যে কথা, শিল্পের বিষয়নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে। প্রাচীন-শিল্পের বক্তব্য বিষয় ও আখ্যানাবলীও সংখ্যায় অল্প ও সুনির্দ্দিষ্ট। পুরুষ-পরম্পরা ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত একই আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন শিল্পী শিল্প রচনা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতে পারে। এক মহাভারতের আখ্যানবস্তু লইয়া কাশীরামদাস ব্যতীত সঞ্জয়, কবীন্দ্র-পরমেশ্বর, নিত্যানন্দ ঘোষ,

[..]মেশ্বর নন্দী প্রভৃতি বহু বাঙ্গালী কবি বঙ্গভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন। [..]ইরূপ বেহুলার উপাখ্যান লইয়া কাণা হরিদত্ত, নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, [..]মানন্দ, কেতকাদাস প্রভৃতি কবি, কালকেতু ও শ্রীমন্তের আখ্যান অবলম্বন [..]রিয়া জনার্দ্দন, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কবি, রাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা অবলম্বন করিয়া বহুতর বৈষ্ণবকবি ও মহাজন আপন আপন কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইউরোপের মধ্যযুগেও দেখা যায় যে, আর্থার, লন্সেলট, পার্সিভাল, আলেকজন্দার, সার্লমেন প্রভৃতি বীরগণের কাহিনী লইয়াই ইউরোপের বিভিন্নদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় বহুতর রোম্যান্স্ কাব্য গদ্যে-পদ্যে রচিত হইয়াছিল। সে কালের কবি ও শিল্পিগণ আখ্যানবস্তুর মৌলিকতা লইয়া চিন্তা করিতেন না। পুরাতন ও লোকপ্রচলিত আখ্যানবস্তু অবলম্বন করিয়া কতকগুলি বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিয়া দেওয়ার দিকেই তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কোনও আখ্যানবস্তু কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না—সেগুলি সমাজেরই সম্পত্তি। এইরূপ অবস্থায় একটি সুবিধা এই ছিল যে, সমাজে কাব্য বা শিল্পের আখ্যানবস্তু সুপরিচিত থাকায় অতি সহজেই শিল্পীর বক্তব্য জন-সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত। তদ্ভিন্ন শ্রোতৃবর্গের এক একটি ভাবতন্ত্রীতে পুনঃ পুনঃ আঘাত পড়ায় সমাজে কতকগুলি বিশেষ ভাবের অনুশীলন হইত। যখন ভাবরসাস্বাদ অপেক্ষা কৌতূহলপরিতৃপ্তি ও মানসিক উত্তেজনাই শিল্পচর্চ্চার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িল, সেই লঘুচিত্ততার যুগেই শিল্পিগণকে নিত্য নূতন আখ্যানবস্তু-রচনার জন্য নানা কষ্ট-কল্পনার আশ্রয় লইতে হইল।

আখ্যান-বস্তু ও ভাব সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, রচনাভঙ্গী ও অলঙ্কারের দিক্ দিয়াও সেই কথা বলা যাইতে পারে। এখানেও দেখা যায় যে, কতকগুলি বিশেষ রচনাভঙ্গী শিল্পিসমাজের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের" প্রণেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থমধ্যে বাঙ্গালী কবির অনুকরণপ্রিয়তার উল্লেখ করিয়া অনেকগুলি দৃষ্টান্ত একত্রিত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের সেই অংশ এ স্থলে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতে পারে:—"কেবল বড় বড় কাব্যে নহে, কাব্যের অংশগুলিতেও সেই অনুকরণবৃত্তির পরিচয় লক্ষিত হয়। একটি উৎকৃষ্ট ভাব পাইয়া কবিকে প্রশংসা করিবার পথ নাই; কোন্ কবি সেই ভাবের আদি প্রণেতা, সে প্রশ্ন সহজে মীমাংসিত হইবার নহে। আমরা প্রতি চণ্ডীকাব্যেই ফুল্লরা ও

খুল্লনার 'বারমাস্যা' পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে পদ্মাবতীর বারমাস্যা, পদকল্পতরুতে বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরগুলিতে বিদ্যার 'বারমাস্যা', সৈয়দ আলওয়াল কবির পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা, মুরারি ওঝার নাতি শ্রীধর প্রণীত রাধার বারমাস্যা, সেক জালাল প্রণীত সখীর বারমাস্যা এইরূপ রাশি রাশি বারমাস্যার সঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘাটে পথে সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। বিদ্যাপতির 'না পুড়িও মোর অঙ্গ না ভাসাও জলে। মরিলে রাখিও বাঁধি তমালের ডালে॥ কবহুঁ সোপিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥' এ কবিতাটির ভাব রাধামোহন ঠাকুর—'এ সখি করতহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে দেহ উপেখব মৃত তনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর॥' যদুনন্দন দাস—'উত্তরকালে এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালের কাঁধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চয় করিয়া তুমি রাখিবা বাঁধিয়া॥' ইত্যাদি পদে এবং এতদ্ব্যতীত নরহরি, কৃষ্ণকমল, 'কবিশেখর' প্রভৃতি বহুকবি স্বরচিত পদে নকল করিয়াছেন।" শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবু প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের এই বিশেষত্বটুকুকে বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন এবং ইহাকে বাঙ্গালীসুলভ অনুকরণপ্রিয়তা বা পুচ্ছগ্রাহিতার দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এটি বাঙ্গালা সাহিত্যের বা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ নহে, ইহা প্রাচীন সামাজিক শিল্পমাত্রেরই লক্ষণ। মধ্যযুগের ইংরাজী, ফরাসী, বা জর্ম্মাণ সাহিত্যেও এই ভাব সাদৃশ্য ও রচনা-সাদৃশ্যের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগেও এই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সাহিত্যের অবনতির যুগে এই ভাবভঙ্গী ও অলঙ্কার-সাদৃশ্য বিকার প্রাপ্ত হইয়া নির্জ্জীবতা ও নীরসতার সৃষ্টি করে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু সাহিত্যের জীবন্ত অবস্থায় এই সকল পর-পরাগত ভাব ও উপমা নানা অপ্রত্যক্ষ ভাব ও দৃশ্যের ব্যঞ্জনাদ্বারা, নানাপ্রকার স্মৃতির উদ্রেক করাইয়া দিয়া, জনসাধারণের মনে যে ঘনরসের সৃষ্টি করে, তাহা অপূর্ব্ব। বিশেষ করিয়া চিত্র বা ভাস্কর্য্যশিল্পে এই বাঁধা রচনাপদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে, ইহাতে শিল্পিগণের বক্তব্য জনসাধারণের পক্ষে সহজে অধিগম্য হয়। শিল্পব্যাখ্যা ও শিল্পসমালোচক বলিয়া এক শ্রেণী মধ্যস্থের আবশ্যকতা থাকে না। আজকাল

শিল্পের রাজ্যে নানা অভিনব প্রণালী প্রত্যহ অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে একটা এই ফল দাঁড়াইয়াছে যে, বিশেষজ্ঞ শিল্পসমালোচকের ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে শিল্পের বক্তব্য বিষয় সহজে সকলের অধিগম্য হয় না।

এইবার চরিত্রচিত্রণের দিক্ দিয়া এই উভয়বিধ সাহিত্যের তুলনা করা যাইতে পারে। উপন্যাসই আধুনিক সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে স্বতন্ত্র মানব-চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়। প্রাচীন সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ ব্যক্তি-চরিত্র অপেক্ষা আদর্শচরিত্র চিত্রণেই বিশেষ মনোযোগ দিলেন। জনসাধারণের সম্মুখে সামাজিক গার্হস্থ্য ও ধর্ম্ম-জীবনের আদর্শগুলি স্থাপন করাই এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। মানুষে মানুষে যে কত প্রভেদ, আধুনিক উপন্যাস পাঠে আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি কিন্তু প্রাচীন কাব্য কথা কাহিনীতে মানুষ কোন্ কোন্ আদর্শও উচ্চ ভাবের সম্মুখে নতমস্তকে একত্র হইয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে, তাহারই বার্ত্তা শুনিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত উপায়ে সমাজমধ্যে যে ভ্রাতৃত্বভাব বা সৌভ্রাত্রের উদ্ভব হয়, তাহা নানা সামাজিক বৈষম্য সত্ত্বেও রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, প্রভু, ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, উচ্চ, নীচ, সকলকেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দেয়। চেষ্টারটন্ সাহেব তাঁহার Victorian Age in Literature গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে চসারের ক্যাণ্টারবেরী কাহিনী (Canterbury Tales) এবং থ্যাকারের উপন্যাসের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, চসারের কাব্যে নাইট্, স্কোয়্যার, ময়দাওয়ালা, কৃষক, ছাত্র, পুরোহিত, মঠের মোহন্ত প্রভৃতি সমাজের বিভিন্নস্তর হইতে যে সকল চরিত্র একত্রিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রচুর; অপর দিকে থ্যাকারের উপন্যাসের চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পর্য্যায়ের লোক। চসারের কাব্যে ধনী নির্ধন, উচ্চনীচ সকলে মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া কাহিনী বলিতে বলিতে ক্যাণ্টারবেরীর সেণ্ট টমাসের সমাধি উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রায় চলিয়াছে। তীর্থযাত্রা উপলক্ষে সকলে মিলিয়া যে আদর্শের ছায়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তুলনায় সামাজিক সমস্ত বৈষম্য তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু থ্যাকারের উপন্যাসে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ একত্র মিলিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারেন, এরূপ কল্পনা স্বপ্নেও কাহারও মনে উদিত হইবে না। অথচ থ্যাকারের যুগে সাম্যমৈত্রীর জয়ধ্বনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল।

চেষ্টারটন সাহেব বলেন, তাহার কারণ এই যে, আধুনিক সমাজের মাথার উপরে ধর্ম্ম বা তত্তুল্য অন্য কোনও উচ্চ আদর্শ বর্ত্তমান নাই। চসারের সমাজ ও থ্যাকারের সমাজ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, আমাদের দেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যে চিত্রিত সমাজ সম্বন্ধে ঠিক সেই কথাই বলা যাইতে পারে।

এইবার শিল্প ও সাহিত্য প্রচারের দিকটা দেখা যাউক। আধুনিক সাহিত্য মুদ্রিত গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, সুতরাং ইহা অনেক পরিমাণে অধ্যয়নকক্ষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে। প্রাচীন সাহিত্য কিন্তু কেবল গ্রন্থমধ্যে আবদ্ধ থাকিত না। অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যই গানের জন্য রচিত হইত, এবং গান, আবৃত্তি, কথা প্রভৃতির দ্বারা পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচারিত হইত। সামাজিক জীবনের নানা পর্ব্ব ও উৎসব উপলক্ষে এই সকল কাব্য সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গীত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের মনসার গান, চণ্ডীর গান, শিবের গান প্রভৃতি ও মধ্যযুগের ইউরোপের রোম্যান্স কাব্য গুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আধুনিক সমাজে যে পরিমাণে ভাবরসচর্চ্চা উঠিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, সেই পরিমাণে সামাজিক জীবনে যে সকল আনন্দমিলনের ক্ষেত্র ছিল, তাহা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের ডেমোক্রেশী Democracy বা প্রজাতন্ত্রের যে আদর্শ, তাহাতে প্রীতি অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের ভাবই প্রবল। সুতরাং এই ডেমোক্রেশির আদর্শ অবলম্বন করিয়া কোনও সামাজিক মিলনক্ষেত্র বা সামাজিক শিল্প সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সাহিত্য এখন ক্রমশঃ বিশেষভাবে কেবল কলারসাভিজ্ঞ পণ্ডিতসমাজেরই উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে, নিরক্ষর অশিক্ষিত জনসমাজের সহিত তাহার আরও কোন সম্পর্ক নাই। সাহিত্য সম্বন্ধে যে কথা, শিল্প সম্বন্ধেও সেই কথা। আধুনিক চিত্র ও মূর্ত্তি প্রভৃতি আর্টগ্যালারীর কাচের আলমারীতে শোভা পাইয়া বিশেষজ্ঞের আনন্দসম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন শিল্প ঘটী বাটী সাজ সরঞ্জাম হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দিরাদির প্রাচীরগাত্রে চিত্রিত বা ক্ষোদিত কাহিনী পর্য্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই সামাজিক সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাবুকতার পরিচয় প্রদান করিত।

অবশেষে শিল্পী ও শিল্প-সৃষ্টির দিক হইতে একবার উভয়বিধ শিল্পের প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করা যাউক। প্রাচীন শিল্পে শিল্পী সামাজিক ভাব বা আদর্শের

ভৃত্য বা সেবকমাত্র। বিষয় ও ভাব নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া রচনাভঙ্গী পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই শিল্পীকে প্রচলিত বাঁধা পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইত। কেহ কেহ মনে করেন, এ অবস্থায় শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ সম্ভবপর নহে। কিন্তু বাঁধা পদ্ধতি প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাধাস্বরূপ না হইয়া সহায়রূপেই পরিণত হয়। কারণ, কবিকে নিজের ভাষা, নিজের মালমশলা নিজে সৃষ্টি করিয়া লইবার জন্য বৃথা শক্তিক্ষয় করিতে হয় না। প্রচলিত ছাঁচের মধ্যে রসপ্রতিষ্ঠাই তাঁহার প্রধান কার্য্যের মধ্যে গণ্য হয়। সুতরাং প্রাচীন শিল্পের একটা গুণ এই দেখা যায় যে, তাহা অতি সহজেই শ্রোতা বা দ্রষ্টার অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক করিতে সমর্থ হয়। অপর দিকে যে সকল শিল্পী প্রতিভা হিসাবে নিকৃষ্ট, তাঁহাদিগকেও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের শিল্প-রচনা-চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হইতে পারিত না। বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃদিগের মধ্যে সকলেই কিছু চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকক্ষ ছিলেন না—তথাপি এক নির্দ্দিষ্ট পন্থা ও রচনাভঙ্গী অবলম্বন করার দরুণ সকলেরই রচনা বেশ সরস ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। আধুনিক শিল্পী যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হন, তাহা হইলে তাঁহার শিল্প-রচনা-চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থতায় পরিণত হয়।

আর এক দিকেও প্রাচীন শিল্পীর সুবিধা ছিল। প্রাচীনকালে যে ভাবের আবহাওয়ার মধ্যে জনসমাজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত, তাহা শিল্প-রচনার পক্ষে বিশেষ অনুকূল। শিল্পী সমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যেই শিল্পের উপকরণ পাইতেন। এখন সামাজিক জীবনে ভাবের হাওয়া বহে না, সুতরাং শিল্পীকে কষ্ট-কল্পনা করিয়া প্রায়ই প্রাচীন সমাজের চিত্রপট কল্পনার সাহায্যে সম্মুখে ধরিয়া শিল্প রচনা করিতে হয়। কারণ, আধুনিক জীবনের শুষ্কতার মধ্যে শিল্পের মালমশলা বড় বেশী পাওয়া যায় না। এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের ইংরাজ কবিদিগের মধ্যে প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের আখ্যানাদি ও সেই সেই যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনার একটা চেষ্টা দেখা যায়। এই সকল কারণে পাশ্চাত্যজগতে ভাবপ্রাণ শিল্পী ও সাহিত্যিকগণ অনুকূল বেষ্টনীর অভাবে হাঁফাইয়া উঠিয়াছেন। সে দিন বর্ত্তমান ইংলণ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠ কবি ইয়েট্‌স্ (W B. Yeats) কবিবর রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গীতাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে কবি ও শিল্পীদিগের বার আনা শক্তি ও উদ্যম বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিকের সহিত সংগ্রামেই

ব্যয়িত হয়। শিল্পীর সমস্ত শক্তি এখন আর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে নিয়োজিত হইতে পারে না। প্রমাণ-স্বরূপ রস্কিন ও মরিসের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যব্যাখ্যাই স্ব স্ব জীবনের মুখ্য সাধনা বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন, বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা শিল্প-সৃষ্টির অনুকূল নহে, অথচ বর্ত্তমান জীবন্ত সমাজের মধ্য হইতে অনুপ্রাণনা না পাইলে কি শিল্পসৃষ্টি হইতে পারে? কষ্টকল্পনা করিয়া প্রাচীন যুগের স্বপ্ন রচনা আর কতদিন করা যায়? তাঁহারা দেখিলেন, আধুনিক সমাজের এই শুষ্কতার মধ্যে পুনরায় ভাবরসের সঞ্চার করিতে না পারিলে শিল্পের উৎস একেবারে শুকাইয়া যাইবে। তাই তাঁহারা আধুনিক সমাজব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহাদিগের সেই আকাঙ্ক্ষার বাণী এখন পাশ্চাত্যজগতের নানা স্থান হইতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ভাবুকমাত্রই এখন প্রাচীন সমাজের মত একটা কোনও ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্ত্তনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন।

এতক্ষণ আমরা আমাদের মূল বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য সমাজের কথাই আলোচনা করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, বর্ত্তমান যুগের জীবনযাত্রা-প্রণালীর যে সকল বিশেষ ধর্ম্ম আমাদের সমাজে ক্রমশঃ সংক্রামিত হইতেছে, তাহার পূর্ণপরিণতির চিত্র দেখিতে হইলে পাশ্চাত্য সমা-জেই দেখিতে হইবে। আমাদের সমাজে আধুনিক সভ্যতার পূর্ণপরিণত স্বরূপ বেশ স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। এখনও আমরা অন্ততঃ সমাজের বারো আনা লোক যাত্রা কীর্ত্তন কথকতায় রস পাই, এখনও আমাদের দেশে পারি-বারিক ও সামাজিক সকল প্রকার বন্ধন শিথিল হইলেও ছিন্ন হয় নাই। Old Age Pensionএর আইন শীঘ্র পাশ করিতে হইবে, কি আশু নারীসমাজকে রাজনীতিক ভোটযুদ্ধে নামাইয়া দিতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা এখনও আমাদের মনে স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের তুলনায় আমাদের সামা-জিক বন্ধনগুলি যে অনেকটা শিথিল হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। এখন আর সেরূপ স্বাভাবিকভাবে মন্দির জলাশয় বৃক্ষ পান্থশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় না, অন্ততঃ ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ও যে যে সমাজে ইংরাজী শিক্ষা ও ইংরাজী আদর্শের প্রবল প্রতাপ, সেই সেই সমাজে ও প্রদেশে এই সমাজধর্ম্মপালন একরূপ বন্ধ হইয়াছে। এ অবস্থায় দেশের শিক্ষিত-সম্প্র-দায়ের মধ্যে শিল্প-সাহিত্য ও সমাজব্যাপারে দেশীয় ভাব রক্ষার জন্য যে এক

ভন আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহা সমাজের পক্ষে ও শিল্প-সাহিত্যের পক্ষে শুভ-লক্ষণ মনে করিতে হইবে। কিছুদিন হইল, চিত্রশিল্পের রাজ্যে এই বাঙ্গালা দেশে এইরূপ একটা ভারতীয়ভাব ফুটাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যেও এই চেষ্টার অল্পাধিকপরিমাণে পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবল শিল্প ও সাহিত্যের রাজ্যে ভারতীয়ভাব ফুটাইবার চেষ্টা করিলেই চলিবে না। সমাজের চারি দিকে যদি বিদেশী ভাবের, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হাওয়া বহিতে থাকে, শিল্পী ও সাহিত্যিককে যদি প্রাত্যহিক সংসারের কার্য্যে পাশ্চাত্য স্বাতন্ত্র্যের আদর্শই অনুসরণ করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্র বা কাব্যের বিষয় বা রচনাভঙ্গী ভারতীয় হইলেও, ভাবের আন্তরিকতার অভাবে সেই শিল্প একপ্রকার সৌখীনতা বা স্বপ্নবিলাসের মত হইয়া পড়িবে। সেই জন্য এখন দেশীভাবে দেশী ছাঁদের শিল্পচর্চ্চা করিতে হইলে সমাজের মধ্যেও সেই সকল দেশীভাব রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সময়ে আমাদের এই চৈতন্যোদয় হইয়াছে, সে সময়ে আমাদের পুরাতন সামাজিক জীবনের প্রাণ-শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। গার্হস্থ্য পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের যে সকল দেশী আদর্শ, তাহা এখনও অনেক পরিমাণে বজায় আছে। এখনও পুরাতন আনন্দ-মিলনের ক্ষেত্রগুলি বর্ত্তমান। যাঁহারা দেশী শিল্প ও দেশী সাহিত্য চান, তাঁহাদিগের এই জীবন্ত সমাজকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। এই ক্ষীণপ্রাণ সমাজ-শরীরে প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করিয়া ইহাকে পুনরায় সবল করিতে না পারিলে শিল্পের রাজ্যে ভারতশিল্প ও সাহিত্য সেই Pre-Raphaelite দের শিল্পের মত অতীত যুগের স্বপ্ন লইয়া খেলায় মাতিয়া থাকিবে। তাহা সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

সমাজের ক্ষেত্র হইতে শিল্প-সাহিত্য যেমন জীবনীরস সংগ্রহ করে, অপর দিকে তেমনই সমাজের পুনরুজ্জীবন কার্য্যেও শিল্প-সাহিত্য সহায়তা করিতে পারে। শিল্পিগণ যদি জীবন্ত সমাজের অনুপ্রাণনায় ধন্য হইতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে এখন কিছুদিন এই সামাজিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁহাদিগের শিল্প-চেষ্টা পরিচালিত করিতে হইবে। তাঁহারা আদর্শ সমাজের জীবন্ত উজ্জ্বল চিত্র লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করুন ও ভাবরসসৌন্দর্য্যহীন মানবসম্বন্ধলেশ শূন্য আধুনিক সমাজের যে বীভৎসতা, তাহাও যথাযথরূপে অঙ্কিত করিয়া দেখান। পাশ্চাত্য জীবনপ্রণালীর যে মোহিনী-শক্তি আমাদের

উপর একটা প্রভাব বিস্তার করিতেছে, পাশ্চাত্য সমাজের পূর্ণপরিণত সার্ব্বাঙ্গীন চিত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতা বা সংস্কারের অভাব তাহার একটা কারণ। এই কৃত্রিম ঐন্দ্রজালিক মোহ নষ্ট করিয়া দিয়া আমাদের মনশ্চক্ষুর স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; সেইরূপ, প্রাচীন সমাজের যে লোভনীয়তা, তাহাও পরিপূর্ণ জ্ঞানের অভাবেই আমাদের সম্মুখে সেরূপ প্রতিভাত হইতেছে না। সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ কিছুদিন এই সমাজচিত্রকেই নিজ নিজ রচনার বিষয়ীভূত করিয়া লউন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুপ্ত সমাজবোধ এইরূপে জাগ্রত করিয়া দিন। যেন আমাদের এই সনাতন সমাজকে কখনও Old Age Pensions Act বা Insurance Act এর দ্বারা বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইতে না হয়। যেন পুনরায় আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে মিলিয়া পুনরায় সাংসারিক জীবনে ভাবের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, বৃহৎ সামাজিক ভাবের মধ্যে আপন আপনব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ডুবাইয়া দিয়া যেন আবার সামাজিক সাহিত্য ও শিল্পের রসাস্বাদন করিতে সমর্থ হই। *

শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

বৈদিক যুগের বেশ-ভুষা।

মানসিক ও নৈতিক উন্নতির প্রকৃতি দেখিয়াই মানবের যথার্থ সভ্যতার বিচার হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা, সাহিত্য-রচনায় কৃতিত্ব ও সামাজিক বিধানের পবিত্রতা যে যথার্থ উন্নতির ও মনুষ্যত্ববিকাশের সাক্ষী, তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই; কিন্তু জাতির বাহ্য সম্পদের পরিচয় হইতেও সভ্যতার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। পরিধেয় বসন-ভূষণের বিবরণে, পরিচ্ছদ ও বেশ-বিন্যাসের পদ্ধতির কথায় প্রাচীনকালের সভ্যতার প্রকৃতি কথঞ্চিৎ অনুমিত হইতে পারে। প্রাচীনকালের যথার্থ ইতিহাসের অর্থ যখন প্রাচীনকালের একটি খাঁটী ছবি তুলিয়া লওয়া, তখন অতীত কালের বেশ-ভূষার বিবরণ পাঠকদিগের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে খুঁজিয়া পাতিয়া সে যুগের বেশ-ভূষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

কেশ-বৃদ্ধি ও কেশ-রচনার প্রতি ঋষি ও ঋষি-পত্নীদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাহাতে মাথায় টাক না পড়ে, এবং চুল খুব ঘন ও বড় হয়, ঋষিরা তাহার জন্য দেবতার কাছে মন্ত্রপাঠ করিতেন (অথর্ব্ব ৬,—১৩৬-

৩৭)। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যেই দীর্ঘ কেশ রাখিবার প্রথা ছিল; কারণ, বশিষ্ঠ-বংশের বিশেষ পরিচয়ে অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঐ বংশের পুরুষেরা মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে চূড়া বাঁধিতেন। পুরুষের পক্ষে স্ত্রীলোকের মত দীর্ঘকেশ ধারণ হয় ত সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল; কেন না, শতপথ-ব্রাহ্মণে লিখিত আছে (৫,—১, ২, ১৪) যে পুরুষের পক্ষে দীর্ঘ কেশধারণ শোভন নহে, এবং উহাতে স্ত্রীজাতিসুলভ কমনীয়তা ও দুর্ব্বলতা সূচিত হয়।

ঠিক্ যাহাকে শিখা-ধারণ বলে, বৈদিক যুগে তাহা ছিল কি না, সন্দেহ। কেশ দীর্ঘ হইলেও শিখা হয় না; কেন না, শিখা করিতে হইলে চারি দিকের কেশ ছেদন করিতে হয়। শিখা শব্দটি এবং শিখাধারণের পদ্ধতির কথা শতপথ ব্রাহ্মণের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও সাহিত্যে নাই। এই গ্রন্থে ইহাও উল্লিখিত আছে যে, ঐ শিখা মস্তকের মধ্যভাগে গ্রথিত হইত, এবং কেবল মরণাশৌচ পালন করিবার সময়েই ঐরূপ ভাবে শিখাবন্ধনের প্রথা ছিল। পুরুষের পক্ষে অন্য সময়ে শিখা উন্মুক্ত রাখাই রীতি ছিল। অন্য পক্ষে, স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অশৌচ-পালনের সময়ে এবং বিরহের অবস্থায় নারীরা মুক্তকেশা থাকিতেন। অন্য কোনও অবস্থায় কেশ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হইত।

পুরুষের পক্ষে যখন দীর্ঘ-কেশধারণের প্রথা ছিল, তখন অংশতঃ স্ত্রী-লোকের মত কেশ-বিন্যাসের প্রথাও ছিল। চুলের এক প্রকার বিনুনির নাম ছিল "কপর্দ"। ঐ প্রকার বিনুনি-করা চুল বা কপর্দ দেবতাদিগের মধ্যে রুদ্র ও পূষন্ নাকি বশিষ্ঠ ঋষির মত খোঁপা করিয়া পরিতেন। বশিষ্ঠ যে "দক্ষিণতঃ কপর্দ" ধারণ করিতেন, তাহার অনেক উল্লেখ আছে। যে চুলে কোনও রকম বিনুনি থাকিত না, এবং স্বাভাবিকভাবেই লম্বিত হইত, তাহার নাম ছিল "পুলস্তি।" অধিকসংখ্যক লোকেই এই পুলস্তি ধারণ করিত, মনে হয়।

অবিবাহিতা নারীদিগের কেশ-রচনায় একটু নূতনত্ব ছিল। পৃষ্ঠভাগের সমগ্র লম্বিত কেশরাশি চারিটি গুচ্ছে বিভক্ত করিয়া লইয়া চারিটি সূক্ষ্ম বেণীর সংযোগে একটি বড় বেণী বা কপর্দ রচিত হইত; এই কপর্দের নাম ছিল "চতুষ্কপর্দ"। চতুষ্কপর্দ্দ পশ্চাদ্ভাগে দুলিত, এবং উহা কবরী-রূপে গ্রথিত হইত না।

মাথার মাঝখানে সিঁথি করিয়া, কেশের কোনও প্রকার বিনুনি না করিয়া, সমস্ত কেশগুচ্ছ জড়াইয়া নারীরা যে প্রকার খোঁপা বাঁধিতেন, তাহার নাম ছিল "ওপশ"। এই ওপশের উল্লেখ ঋক্ ও অথর্ব্ব বেদে পাওয়া যায়। দেবতাদিগের মধ্যে সিনিবালী এই প্রকারের কেশরচনা করিতেন বলিয়া তাঁহার নামের বিশেষণ হইয়াছিল "স্বৌপশা"। সাধারণ বিনুনি করিয়া যদি খোঁপা বাঁধা না হইত, তাহা হইলে সেই প্রকারের কেশরচনার নাম হইত "পৃথুষ্টুক", এবং "বিষিতষ্টুক"। এই শ্রেণীর কেশরচনা চতুষ্কপর্দ হইতে অল্পমাত্র ভিন্ন। মাথার সিঁথির নাম ছিল "সীমন্" (সীমা); কিন্তু ঠিক "সীমন্ত" নহে।

কেশ-রচনা করিয়া মাথায় ফুল পরিবার প্রথা ছিল, এবং কবরী যাহাতে শিথিল না হয়, তাহার জন্য "কুরীর" নামক এক শ্রেণীর অলঙ্কার পরিহিত হইত। "কুরীর" না জুটিলে "শললী" বা শজারুর কাঁটা ব্যবহৃত হইত।

ধুতি হউক, শাড়ী হউক, পরিধেয় বসনের সাধারণ নাম ছিল "পরিধান"; তবে যেখানে কৌপীন পরিয়া পরে বহির্ব্বেশ পরিহিত হইত, সেখানে সেই বহির্ব্বেশের নাম হইত "প্রবর" বা "প্রবার"।

যুগপৎ কৌপীন ও বহির্ব্বেশ পরিধান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল; এবং পরিহিত কৌপীনের নাম ছিল "নীবি"। পরবর্ত্তী সময়ের সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাই যে, "নীবি" অর্থ বস্ত্রের গ্রন্থি বা কোমরের খোঁট। এখন ছত্রিশগড় ও ছোট নাগপুর ভিন্ন অন্য কোথাও নীবি (বৈদিক অর্থে) ব্যবহৃত হয় বলিয়া জানি না।

পরিবার কাপড় যেন সেকালে একালে একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, মনে হয়। কাপড়ের খাসা পাড় থাকিত, এবং ঐ পাড়ের নাম ছিল "তূষ"; দুইদিকের শেষভাগেই ছিলে থাকিত, এবং ঐ ছিলের নাম ছিল "দশা"। "দশা", এবং কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতরূপে "দশি" শব্দ এখনও অনেক স্থানে ব্যবহৃত আছে।

রমণীরা বস্ত্রার্দ্ধে অঙ্গ আবৃত করিলেও, অনেক সময়ে "দ্রাপি" ও "তার্প্য" ব্যবহার করিতেন। "দ্রাপি" অর্থ সেলাই-করা cloak; এবং "তার্প্য" গরদের অঙ্গ-আবরণ বলিয়া মনে হয়।

কাপড় বুনিবার তাঁতের নাম ছিল "বেমন্"; "তানার" নাম ছিল তন্ত্র। "তন্তু", "তন্ত্র" এবং "পড়েন"-এর নাম ছিল "ওতু"। "মাকু"র নাম

ছিল "তসর"; এখন কিন্তু তসর বলিলে এক রকমের মোটা রেসমের কাপড় বুঝায়।

পশমের প্রচুর ব্যবহার ছিল। কোন প্রকার রঙ্ না করা পশমের চাদরের নাম ছিল "পাণ্ডু" (পাণ্ডু-অ); কিন্তু উহা শেলাই করিয়া, ব্যবহার করিলে উহার নাম হইত "শামুলয়"। "শামুলয়" নামক পরিচ্ছদের ধারগুলি মুড়িয়া শেলাই করা হইত, এবং এই মুড়িভাঙ্গা শেলাইএর বৈদিক নাম ছিল "সিচ্"। শামুলয় কথাটি হইতেই "শাল" শব্দের উৎপত্তি কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। শামুলয় বস্ত্রকে যদি ঢিলা পিরানের মত শেলাই করিয়া লওয়া হইত, তবে তাহার নাম হইত "সামূল"। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত "সামূল"কে woollen shirt বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন।

যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহাদের দুইটি নাম পাওয়া যায়, যথা—"বায়' ও "সিরী"। বায় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "বয়িত্রী" পদ পাওয়া যায়।

কাপড়ের উপরে ফুল-তোলা কিংবা অন্য রকমের সূচের বাহারের কাজ করা স্ত্রী-পরিচ্ছদের নাম ছিল "পেশস্"। এই Embroidered বস্ত্র স্ত্রীলোকেরা কেবল নাচিবার সময়েই পরিতেন বলিয়া অনুমিত হয় (ঋ ১, ৯২, ৪-৫। দেবী উষা যেন উজ্জ্বল বর্ণের "পেশস্" পরিয়া "নৃত্যন্তী যোষিদিব" শোভা পাইতেছেন, এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রী কাপড়ের উপর এইরূপ সূচীকার্য্য করিত, তাহাদিগকে "পেশঃকারী" বলিত। অনেক দিন হইতেই ভদ্ররমণীর নৃত্য উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহারা এ কালে নৃত্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তাহাদের সুখ্যাতি নাই। এই কারণেই পূর্ব্ববঙ্গে "নটী" শব্দ পতিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের "পেশাকার" শব্দও উদাহৃত বৈদিক শব্দের সহিত সম্পর্কিত কি না, বলিতে পারি না।

গরম কাপড়ের জন্য মেষের লোম ("অবি") ও "অজিন" ব্যতীত অন্য কিছু ব্যবহৃত হইত কি না, জানিতে পারা যায় না। "অজিন" প্রথমতঃ অজ বা ছাগের চর্ম্ম অর্থে, এবং পরে হরিণের চর্ম্ম অর্থে ঋগ্বেদ, অথর্ব্ব বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাঘ্রাদির চর্ম্মও অজিন বলিয়া অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায়। গান্ধারের মেষ বেশি "ঊর্ণাবতী" ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

আর্য্যদিগের প্রদেশবিশেষে উষ্ণীষের ব্যবহার স্ত্রীপুরুষের উভয়ের মধ্যেই ছিল বলিয়া ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে বিশেষ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ব বেদে (১৫, ২, ১৩) ইন্দ্রাণীর মস্তকেও উষ্ণীষ থাকার কথা পাওয়া যায়। অনেক বৈদিক উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা পঞ্জাব-সীমান্তে কিংবা আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে বাস করিতেন, তাঁহারাই বিশেষ ভাবে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন; এবং ইঁহারা ব্রাত্য অর্থাৎ হীন বা নিন্দিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ মধ্যদেশের উষ্ণীষ ধারণ না করিবার প্রথা আর্য্যপদ্ধতি বলিয়া, উহা পরবর্ত্তী যুগেও পূর্ব্ব দেশে অনুকৃত হইয়াছিল; এবং তাহারই ফলে বঙ্গে ও ওড়িশায় কদাচ উষ্ণীষ ব্যবহৃত হয় নাই। যজুর্ব্বেদে দেখিতে পাই যে, রাজারা যখন যজ্ঞ করিতে বসিতেন, তখনই মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করিতেন।

বস্ত্রাদি ময়লা হইলেই সেই ময়লা কাপড় চোপড়কেই "মল" বলিত; এবং ধোবার নাম ছিল "মলগ"। পরবর্ত্তী সময়ের "রজক" শব্দ ধোবা অর্থে ব্যবহৃত হইত না; কারণ রজকের কাজ ছিল বস্ত্রাদি রঞ্জ্ করা। ধাতুগত অর্থ হইতেও উহাই সূচিত হয়। আমরাই একালে ভুল করিয়া ধোবার সাধু ভাষা রজক করিয়া তুলিয়াছি, নহিলে রজক আমাদের রঙ্‌রেজ।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন শ্রেণীর "উপানৎ" বা পাদুকা ব্যবহৃত হইত। কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন জন্তুর চর্ম্মেও পাদুকা নির্ম্মিত হইত। শূকরের চর্ম্মে উপানহ্ প্রস্তুত হইত বলিয়া শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত আছে।

কেশ-সংস্কারাদি কার্য্যের জন্য যাহারা নিযুক্ত হইত, তাহাদের নাম ছিল "বপ্তা"; বপ্ অর্থ ঠিক ক্ষৌরী করা। বপ্তা বা নাপিত (নাপিত শব্দটি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন) "ক্ষুর" ব্যবহার করিত, এবং ঐ ক্ষুর খুব ভাল লোহায় প্রস্তুত হইত।

সাজ সজ্জা প্রভৃতির সময়ে মুখ দেখিবার জন্য আয়না ব্যবহৃত হইত, এবং আয়নার নাম ছিল "প্রাকাশ"। বৈদিক যুগের পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষে কাচের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, তাহা প্রাগৈতিহাসিক কালের ব্যবহৃত কাচের সামগ্রীর আবিষ্কার হইতে জানা গিয়াছে। এরূপ স্থলে উল্লিখিত ঋগ্বেদীয় "প্রাকাশ"কে কেবলমাত্র glazed metal used for mirror বলিয়া সুপণ্ডিত মেক্‌ডনেল যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।

বস্ত্রাদি ব্যতীত যে সকল অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত, তাহার সকলগুলির গড়ন সম্বন্ধে ধারণা হওয়া সুসাধ্য নহে। কোনও কোনও অলঙ্কারের কেবল নামমাত্রই

জানিতে পারা যায়; কোন্ অঙ্গে ব্যবহৃত হইত, তাহাও ভাল করিয়া বুঝা যায় না। যাহা হউক, অলঙ্কার গুলির কথঞ্চিৎ বিবরণ দিতেছি।

নারীরা তাঁহাদের ওপশ বা খোঁপার উপর (সম্ভবতঃ খোঁপার উপরিভাগ ঢাকিয়া) "কুম্ব" নামক স্বর্ণালঙ্কার পরিতেন। উহা কি ঠিক দক্ষিণ দেশে ব্যবহৃত মাথার চাঁদের মত ছিল? "কুরীর" চুলের কাঁটার মত ব্যবহৃত হইলেও অলঙ্কারবিশেষই ছিল।

"কর্ণশোভন" বা ইয়ারিং স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করিতেন; তবে পুরুষের পক্ষে গোলাকৃতি "প্রবর্ত্ত" পরাই নিয়ম ছিল। এই প্রবর্ত্তেরই ক্রমবিকাশে দক্ষিণদেশের কুণ্ডলের সৃষ্টি।

বিবাহের সময় কন্যাকে "ন্যোচনী" নামক অলঙ্কার পরিতে হইত। ন্যোচনী যে মুখের সম্মুখভাগে ঝুলিত, তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু উহার গড়ন কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না। ন্যোচনী হইতে প্রাকৃত ভাষায় "ন্যোতনী" হইয়াছিল, মনে হয়। কিন্তু এই বৈদিক ন্যোচনী সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায় না। ন্যোচনীর ন্যোতনী রূপ হইতে আমাদের "নত্" হইয়াছে কি না, তাহা সাহস করিয়া বলিতে পারিব না; তবে শব্দ-সাদৃশ্যে যাহা মনে হইল, তাহাই বলিলাম। পাঠকেরা এ কথাও স্মরন রাখিবেন যে, অনেক বৈদিক শব্দ প্রাকৃতের পথ বাহিয়া আসিয়া আমাদের প্রচলিত ভাষায় রহিয়াছে; অথচ সংস্কৃতে ঐ সকল শব্দ অজ্ঞাত।

"মনা" নামক একটি অলঙ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। টীকাকারেরা অর্থ করিয়াছেন যে, ঐ, অলঙ্কার-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত অভিলাষ বা মন হয় বলিয়া অলঙ্কারটির মনা নাম হইয়াছিল; কিন্তু উহা কি অলঙ্কার, কোথায় পরিত, এ সকল কথা কোনও টীকায় নাই।

"খাদি" নামক একটি অলঙ্কারের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে হিরণ্যখাদির অনেক উল্লেখ আছে। এই চক্রাকার খাদি হাতে (মণিবন্ধে) ও পায়ের নিম্ন প্রদেশে পরিহিত হইত; কাজেই খাদি বলয়ও বটে, anklet ও বটে। ঋগ্বেদের খাদি অনেক পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃতে "খাড়ি" হইয়াছিল, এবং সেই "খাড়ি" হইতেই আমাদের "খাড়ু"র উৎপত্তি বলিয়া অনুমান হয়।

"নিষ্ক" শব্দটি মুদ্রা অর্থে পাওয়া যায়, এবং গলার মালা অর্থেও পাওয়া যায়। এই কারণে অনেকেই অনুমান করিয়া থাকেন যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য নিষ্ক মুদ্রারূপেই ব্যবহৃত ছিল, এবং ঐ মুদ্রাই সূতায় গাঁথিয়া গলার মালা করা হইত।

"রুক্ম" নামক স্বর্ণ-অলঙ্কারটি যে প্রকার অর্দ্ধগোলাকার বলিয়া বর্ণি হইয়াছে, তাহাতে উহা ঠিক হাঁসুলি ছিল, বলিতে পারা যায়।

ঋগ্বেদে যে "মণি"র উল্লেখ আছে, উহা হীরক বলিয়া স্বদেশ বিদেশের সকল পণ্ডিতই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই মণিতে যে ছিদ্র করিতে পারা যাইত, এব অনেক মণি ছিদ্র করিয়া সূতায় গাঁথিয়া হার করিয়া পরিয়া যে বড়মানুষের "মণিগ্রীব" হইতেন, তাহা সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

আমরা যাহাকে মুক্তা বলি, তাহার বৈদিক নাম "বিমুক্তা"। এই মুক্ত কোথায় সংগৃহীত হইত, বৈদিক উল্লেখ হইতে তাহা ধরিতে পারা যায় না। মণির ব্যবহারের মত মুক্তার ব্যবহারও বড়মানুষদিগের মধ্যেই চলিত ছিল।

শঙ্খ হইতে নানা শ্রেণীর অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। সম্ভবতঃ একালে হাতে পরা ভিন্ন উহার অন্য কোনও ব্যবহার প্রচলিত নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দ্বিজেন্দ্র-প্রসঙ্গ।*

সে আজ বহুবর্ষের কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বৃদ্ধপ্রপৌত্রীর বিবাহো পলক্ষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে আমি কবি দ্বিজেন্দ্রলালকে সর্ব্বপ্রথ দর্শন করি। যত দূর স্মরণ হয়—সে দিন সে গৃহে নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্র কবিবর রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র, বিচারপতি আশুতোষ প্রভৃতি বহু সাহিত্য-রসজ্ঞ ব্যক্তি ফরাসের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালে সঙ্গীত-স্রোতে সেদিন হাস্য-লহরীর যে বিচিত্র মোহন লীলা-বিভঙ্গ লক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা এ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারি নাই, বুঝি কখনও পারি-বও না। "নন্দলালে"র স্বদেশপ্রীতি হইতে আরম্ভ করিয়া, "কিন্তু"-পরাহত "হ'তে পারতাম" দলের বিচিত্র কাহিনী সকল তিনি অকুণ্ঠ কণ্ঠে গায়িতে-ছিলেন; আর, ফরাসের উপরে ভারতের শিরোভূষণগুলি সরল হাস্য-বিভায় গৃহতল সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিলেন। কেবলমাত্র কর-স্পর্শ সুখে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়াই সেদিন দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট

---

* গত জ্যৈষ্ঠ মাসে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখার উদ্যোগে এক বিরাটজন-সাধারণ-সভা আহূত হয়। এই বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক এই চরিত-প্রসঙ্গ পঠিত হইয়াছিল।

হইতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহার অনেক পরে একদিন কবি প্রমথনাথের সঙ্গে কলিকাতার, ঝামাপুকুরে একটি ক্ষুদ্র আলয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমি প্রথম সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কবি-সন্দর্শনে ও তাঁহার সহিত সরস আলাপনে সেই অম্লান প্রভাতে আমার যে কত আনন্দই হইয়াছিল, তাহা লিখিয়া বুঝানো অসম্ভব। দ্বিজেন্দ্রলাল সেদিন আমাকে—সেই প্রথম—তাঁহার রচিত পুস্তকগুলি উপহার দিলেন। আমি সেই "সাদরোপহার" প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়াছিলাম।

প্রথম হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম কাপট্যলেশহীন ব্যবহারে আমি বিস্মিত ও আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। Convention বা সামাজিক-লৌকিকতা-শূন্য কবির হৃদয়-ক্ষেত্রে একেবারে অসঙ্কোচেই আমি প্রবেশলাভ করিয়াছিলাম। এ জীবনে ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কত শত গণ্য ও নগণ্য ব্যক্তির সংসর্গে আসিতে হইয়াছে; কিন্তু এমন শিশুসুলভ সারল্য আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

সারল্য ও বন্ধু-বাৎসল্য।

প্রথম পরিচয়ের পর হইতেই উদার-মতি দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ-আত্মীয়তায় পরিণত হইল। বেশ মনে পড়ে—তাঁহার তৎকালে প্রকাশিত "তারাবাই" নাট্য-কাব্যের আমি একটি সমালোচনা করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে সমালোচনাতে প্রচুর পরিমাণে আমার স্পর্দ্ধা প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, মহাপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন সন্ধ্যা-কালে আমার নিকটে আসিয়া, সহসা প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, এবং আমার প্রদর্শিত ত্রুটীগুলি অম্লানমুখেই স্বীকার করিয়া, অপ্রত্যাশিত প্রীতির সুখ-বেদনায় আমাকে "ভাই, ভাই" বলিয়া কতই না কাঁদাইয়াছিলেন! দ্বিজেন্দ্রলালের বিনয়-বর্জ্জিত ব্যবহারের অন্তরালে তাঁহার যে বিরাট্ হৃদয় ছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা এ কথা আজ অকপটেই স্বীকার করিবেন যে, অমন শিশুর ন্যায় সরল ও কোমল, আকাশের ন্যায় প্রশান্ত ও উদার, মেঘের ন্যায় গম্ভীর ও অমিয়-বর্ষী হৃদয় এ সংসারে বস্তুতই পরম দুর্লভ সামগ্রী। অপ্রতিহত নির্ভীকতা ও সারল্য-জাত, স্বভাব-সুলভ স্পষ্টবাদিতার দরুণ যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে 'অহঙ্কারী' 'দাম্ভিক' প্রভৃতি আখ্যায় অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরই অবগতির উদ্দেশ্যে আমি এই ব্যক্তিগত ঘটনাটির উল্লেখ আবশ্যক বোধ করিলাম। আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত এ সংসারে কেহ কোনও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে

না। দ্বিজেন্দ্রলালেরও আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস চিরদিনই ভাবে অক্ষুণ্ণ ছিল। যে অদম্য প্রতিভার অপার্থিব প্রভায় আজ এই হতভাগ্য বঙ্গভূমি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, সে দিব্যশক্তির স্পন্দন দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন, এবং অত্যধিক সারল্যবশতঃ অনেক সময়ে তাঁহার সে বিশ্বাস 'দম্ভ' বা 'অহঙ্কারে'র ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের মহান্ চরিত্রের এই নিগূঢ় সত্যটুকু সূক্ষ্মদৃষ্টির সাহায্যে যাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই, তাঁহারাই তাঁহাকে 'অসামাজিক'ও 'অহঙ্কারী' প্রভৃতি বলিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করেন না।

পত্নী-বিয়োগ ও সংযম।

এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সহধর্ম্মিণী একটি বালক ও এক শিশু-কন্যার ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করিয়া সহসা পরলোকে প্রয়াণ করেন। দলে দলে দ্বিজেন্দ্রলালের গুণ-মুগ্ধ কত ব্যক্তি তৎকালে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার শোক-তপ্তচিত্তে সান্ত্বনা দান করিবার প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু অতুল প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল সান্ত্বনা-দানের ব্যর্থ চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অনেক সময়ে একান্তই অশোভনভাবে হাস্যালাপ করিতে থাকিতেন; কখনও বা সঙ্গীত-সুধায় সকলকে অভিনন্দিত করিয়া বিদায় দিতেন। এই সময়ে একদা দ্বিপ্রহরে একাকী পাইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"আপনি এমন করিয়া এ সময়ে কি করিয়া অত হাস্যালাপ করেন, বুঝিতে পারি না।" তদুত্তরে দ্বিজেন্দ্রলাল গলদশ্রুলোচনে আমাকে বলিয়াছিলেন—"সবই পারি; কিন্তু, তার প্রসঙ্গ বা এই সকল নিয়ম-নির্দ্দিষ্ট, মৌখিক সান্ত্বনা-বাক্য আমার সহ্য হয় না। সে যে আমার কি ছিল, তাহা তোমরা কি বুঝিবে!" এই কথা বলিয়া কবিবর পুত্র-কন্যা দু'টির দু' হাত ধরিয়া, গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার অর্গল-রুদ্ধ করিলেন। আমি একাকী কিছুক্ষণ সেই শূন্য গৃহতলে অপেক্ষা করিয়া, এই মহাজনের অতুল প্রণয়ের অপরিমেয় গভীরতার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম। বলা বাহুল্য, পত্নী-হারা দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার লোকান্তরিতা প্রেমময়ী দেবীর সম্বন্ধে কোনও প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত শুনিতে বা বলিতে পারিতেন না। বহু প্রলোভন ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি আর দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেন নাই। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কি প্রকার নিবিড় ও অচপল ছিল, তাহা 'আলেখ্য' কাব্যের "বিপত্নীক", "মাতৃহারা" "বিধবা" ও "হতভাগ্য" কবিতাগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন,

তাঁহারা কথঞ্চিৎ অনুমান করিতে পারিবেন। একবার মনে পড়ে,—তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ায় তিনি আমাকে ভয় দেখাইবার ছলে লিখিয়াছিলেন—"আমি তো আবার বিবাহ করিতেছি। বেশ কথা,—না?" আমি তদুত্তরে তাঁহার সে কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া, যখন প্রকৃত ঘটনা কি, জানিতে চাহিয়াছিলাম, তখন প্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে জানাইয়াছিলেন, —"বিবাহ সম্বন্ধে তোমার ধারণাই ঠিক। কাম-পরিণয় সমাজের দিক্ দিয়ে সমর্থিত হ'লেও হৃদয় তা'তে বাধা দেয়। সমাজকে জীবনে অনেক ঠকিয়েছি; কিন্তু, নিজেকে—হৃদয়কে ঠকিয়ে কেমন করে' বাঁচব ভাই? 'বিয়ে লোকের আর ক'বার হয়'—এ তোমার লাখ কথার এক কথা।" দ্বিজেন্দ্রলাল বিবাহ করিলেন না। চিরজীবন অসীম সংযমে তিনি মোটা কাপড় ও সাধাসিধা চালই বজায় রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবন—আদর্শ বিপত্নীক জীবনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। গত দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কেহ তৈল বা সাবান ব্যবহার করিতে দেখে নাই। রুক্ষ কেশ, মলিন বেশ, নগ্ন গাত্র, নগ্ন পদ বিলাত-ফেরত দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বাড়ীতে "ডুপ ডুপ" করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—আজও সে দৃশ্য যেন স্পষ্ট চোখেই দেখিতে পাইতেছি। তিনি যে শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ না করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে;—বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রলাল আচারে, ব্যবহারে, জ্ঞানে, কর্ম্মে ও চিন্তায় যথার্থ বিধবারই ন্যায় অসীম সংযম—অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতার ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর গলিতে কবিবর প্রাসাদসদৃশ সুদৃশ্য এক দ্বিতল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া সে ভবনের নাম রাখিয়াছিলেন—'সুর-ধাম'। আমি সে নামের সার্থকতা না বুঝিয়া একদিন এই কবিত্বহীন নাম-করণ লইয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ করিলে, আমার নিকটে আসিয়া, কবিবর জনান্তিকে বলিলেন—"জান না? এ বাড়ী যে তাহার। আমি এখানে তাহারই স্মৃতির অন্তরালে ডুবিয়া থাকিব। তারই নাম ছিল—সুরবালা!" রহস্য উদ্ঘাটিত হইলে আমি এ প্রশ্ন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার দরুণ প্রাণে বড় ব্যথা পাইলাম। তখন, কেন জানি না, সীতা-বিরহিত রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল।

সংসারের নানা কার্য্যে লিপ্ত রহিয়াও তিনি নিতান্ত নির্লিপ্তের ন্যায়—আলু-থালু ভাবে—সন্ন্যাসীরই মত জীবনযাপন করিয়া গিয়াছেন। লোক-নিন্দা-নিরপেক্ষ দ্বিজেন্দ্রলাল জীবনে কখনও পর-মুখাপেক্ষী হন নাই। ভ্রষ্ট

চরিত্র লোকের মধ্যে গুণের সন্ধান পাইলে তিনি তাহার সহিত অসঙ্কোচে মিশিয়াছেন।—আগুন লইয়াও তাঁহাকে খেলা করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও হাত পোড়ান নাই। শত বাসনার বিবিধ ও বিচিত্র প্রলোভন অতি সহজেই উপেক্ষা করিয়া,—

প্রলোভন হ'তে দূরে, বিজনে, অরণ্য-কোণে,
যোগী কি বৈরাগী
সংবরিতে আত্ম-মন, যে সাধন-সিদ্ধিতরে
নিত্য রহে জাগি'—

তিনি সে সাধনে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিতই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা দ্বিজেন্দ্রলালকে একদিন "নীতিবাদী" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে সাহস করিয়াছিলেন, নিষ্প্রয়োজন হইলেও, আমি তাঁহাদেরই অবগতির জন্য এই কথাটা আলোচনা করা সঙ্গত মনে করিলাম।

স্বদেশ-প্রেম।

আর একদিনের একটা ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তখন কবিবর ৫নং সুকিয়া ষ্ট্রীটে বাস করিতেন। রবিবার; প্রাতঃকালে আমরা অনেকে তাঁহার বসিবার ঘরে গল্প-গুজব করিতেছি; সহসা দূর হইতে একটা সুর আমাদের কাণে ভাসিয়া আসিল। তখন স্বদেশী-আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ পরিপ্লাবিত;—ঘরে বাহিরে পথে ঘাটে নগরে প্রান্তরে সর্ব্বত্র নব-জীবনের বিপুল বন্যা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবহমান। আমরা তড়িৎবেগে সে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিলাম। দেখিলাম—কতকগুলি যুবক দল-বদ্ধ হইয়া মাতৃনাম গায়িতে গায়িতে চলিয়াছেন, সঙ্গে শত শত লোকমন্ত্রমোহিত চিত্তে সে সঙ্গীত-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহ-সমক্ষে আসিয়া সেই বিপুল জন-স্রোত সহসা সংক্ষুব্ধ ও গতিহীন হইয়া পড়িল। তখন সেই ভাব-তরঙ্গে মাতোয়ারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং সে গানে যোগদান করিলেন, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তিন চারিবার জলদ-নির্ঘোষে "বন্দে মাতরম্"-মন্ত্রে গগন প্লাবিত করিয়া দিলেন। সেইদিন তাঁহার রক্তিম মুখ-মণ্ডলে মহাসমারোহের যে জ্বলন্ত জ্যোতির্ব্বিভা দেখিয়াছিলাম, তাহা এ দগ্ধ হৃদয়-পটে চিরজীবন স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। প্রকাশ্য স্থানে দাঁড়াইয়া মাতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল যে সঙ্গীত ও যে মন্ত্র বারংবার গায়িয়া উঠিয়াছিলেন, আজ এ হতভাগ্য দেশ সে গান আর শুনিতে পাইবে

না! আজ সে গভীর-গম্ভীর স্বর-তরঙ্গ একেবারেই অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে! স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ায় আমাকে একদিন কবিবর বলিয়াছিলেন—"এ দেশ আজ যদি পর-প্রসঙ্গ ও বিজাতি-বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রকৃত কল্যাণ-সাধনে তৎপর হয়, তবে এ জগতে এমন কোনও শক্তিই নাই যে, তাহার সে বলদৃপ্ত গতির রোধ করিতে পারে। কিন্তু অযথা এ অশোভন আস্ফালন ও যাহারা আমাদের শিক্ষা-গুরু—যাহাদের কৃপায় ও পুণ্যবলে আমাদের আজ এই যা' কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আমাদের এ অন্ধ বিদ্বেষ যতদিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের উদ্ধারের কোনও উপায়ই আমি দেখি না।" আজ দূরদর্শী রাজনীতিক দ্বিজেন্দ্রলালের সেই ভবিষ্যদ্বাণী আমার মানসশ্রবণে এখনও ঝঙ্কৃত হইতেছে। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল "প্রতাপসিংহ" নাটক প্রকাশিত করেন, এবং ভারত-গৌরব দুর্গাদাসের অমূল্য জীবন অবলম্বনে নাটকপ্রণয়নে রত হন। দুর্গাদাসের অনিন্দ্য আদর্শ চরিত যাঁহারা রাজস্থানে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কবিবরের "দুর্গাদাস" পাঠ করিলে বুঝিবেন,—যোগ্য কবির হাতে সে চিত্র কিরূপ বিচিত্র নৈপুণ্য সহকারে প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কি ব্যক্তিগত জীবনের আচার-ব্যবহারে—কি সাহিত্য-সাধনার অবকাশে কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশের ও স্বজাতির প্রকৃত কল্যাণকল্পে যে অনুপম সাহস ও অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে যদি কখনও যথার্থ স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয়, তবে সেইদিন দেশবাসী সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে নেত্র-জলে এই স্বদেশ-প্রাণ কর্ম্মবীরকে অকৃত্রিম প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

একবার পূজাবকাশে আমি গয়ায় গিয়া কয়েকদিন আমার নমস্য ও প্রাণপ্রিয় সুহৃত্তমের অতিথি হইয়াছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালে গয়ার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময়ে এই অযোগ্য লেখক সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত একত্র বসবাস করিবার শুভ অবসর পাইয়াছিল। একদিন দুপুরবেলা আহারান্তে বসিয়া আছি, কবিবর বলিলেন—"দেখ, আমার মাথায় একটা গানের কতকগুলো লাইন আসিয়া ভারি জ্বালাতন করিতেছে, তুমি একটু বোসো;—আমি সেগুলো গেঁথে নিয়ে আসি।" অর্দ্ধঘণ্টা বা তাহারও কিছু অধিক কাল একাকী বসিয়া রহিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল দূর হইতে করতালি দিতে দিতে গায়িতে গায়িতে আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন, এবং আমাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়া কহিলেন,—"উঃ! কি চমৎকার গানই লিখেছি। শুন্‌বে? শুন্‌বে না কি? আচ্ছা, তবে শোন"—এই বলিয়া গায়িয়া উঠিলেন,—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ।"

গানটা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম; তখন, বলিতে লজ্জা হয়—পাষণ্ড আমি, আমারও চক্ষে জল আসিয়াছিল; আমি নীরবে, নতশিরে একটা অপার্থিব অনুভূতির আবেগে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বন্ধুবর বলিলেন—"কি? কেমন লাগল?" আমি বলিলাম—"ধন্য আপনি!" বালস্বভাব দ্বিজেন্দ্রলাল একবার শুধু আমার মুখের দিকে হাসিয়া চাহিলেন; পরে আর কিছু না কহিয়া, হাতে তাল দিতে দিতে নাচিয়া নাচিয়া গায়িলেন—

"কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা,
কিসের ক্লেশ?
সপ্ত কোটী মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন
আমার দেশ!"

সে রাত্রে যথারীতি পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত লোকেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের আবাসে আসিয়া এই অগ্নি-গর্ভ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া উৎসাহে, গর্ব্বে, আনন্দে, বিস্ময়ে ও ভক্তির প্রাবল্যে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীযুক্ত লোকেন পালিত মহাশয় তৎকালে গয়ার জজ ছিলেন—প্রত্যহই সন্ধ্যার সময়ে বন্ধু-বৎসল পালিত মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের গৃহে আসিতেন, এবং সাহিত্যিক বিতর্ক-বিচারে রাত্রি প্রায় একটা দুইটা পর্যান্ত যাপন করিতেন। "আমার দেশ" গানটি শুনিয়া লোকেন্দ্রনাথের যে অপূর্ব্ব উৎসাহ দেখিয়াছিলাম তাহা এ জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ নাটক "নূরজাহান" মুদ্রিত করিয়া "মেবার-পতনের" রচনায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। মেবারের গৌরব-ভাস্কর যখন ভারতাম্বরে প্রদীপ্ত, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর যখন সে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপতাপে প্রপীড়িত ও ম্রিয়মাণ—রাজপুত-শৌর্য্যের সেই সৌভাগ্য দিনের মেবারের মহিমা ও গর্ব্বের স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবিবর "মেবার পাহাড়, উড়িছে যাহার রক্ত-পতাকা উর্দ্ধশির" ইত্যাদি যে গানটি লেখেন, এই হতভাগ্য তখন তাঁহারই পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল। সঙ্গীতটি গ্রথিত হইলে আমি

[মে]বারের পতন বিষয়ে আর একটি যোগ্য গান রচনা করিতে বলিলাম। [সে]ই দিনই সন্ধ্যার সময়ে আর একটি গান লিখিত হইল—

"মেবার পাহাড় শিখরে যাহার
রক্ত নিশান ওড়ে না আর!"

[সু]র-সংযোগ করিয়া সঙ্গীত দুইটি আমায় গাইয়া শুনাইলেন। আর এ [জী]বনে সে কণ্ঠ শুনিব না!—হায়, বুঝি তেমন গানও আর রচিত হইবে না।

এই সময়ে কোনও সুবিখ্যাত কবি ও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সরকারী [কো]নও কার্য্যোপলক্ষে গয়ায় আসিয়া কতিপয় দিবস দ্বিজেন্দ্র-সহবাসী [হ]ইয়াছিলেন। একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার ও লোকেন্দ্র পালিত [ম]হোদয়ের অনুরোধক্রমে বন্ধু আমার এই তিনটি গান গায়িয়া শুনাইতে-[ছি]লেন, বিমুগ্ধ শ্রোতা আমরা সে অতুল সঙ্গীত শুনিয়া আনন্দে, বিস্ময়ে [ও] দেশভক্তিতে সত্য সত্যই অভিষিক্ত হইয়া গিয়াছিলাম। সে নিশায় [ক্ষ]ণজন্মা দ্বিজেন্দ্রলালের যে দুর্দ্দম উৎসাহ দেখিয়াছিলাম, এ জীবনে তাহা [কি] কখনও ভুলিবার! দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রীতির অনেক প্রত্যক্ষ ঘটনা [আ]মার এ স্মৃতিপটে আজিও সুস্পষ্ট মুদ্রিত রহিয়াছে; বিধাতা যদি দিন [দে]ন, তবে সে সকল কথা পরে বলিব।

কবিবরের "প্রতাপ সিংহ", "দুর্গাদাস" ও "মেবার পতন" যাঁহারা [অ]ভিনিবেশসহকারে পাঠ করিবেন, তাঁহারাই কবির ঐকান্তিক স্বদেশ-প্রেমের পুণ্য প্লাবনে পরিপ্লুত ও প্রবুদ্ধ হইতে পারিবেন, ইহা আমার [দৃ]ঢ় বিশ্বাস। তাঁহার 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' বঙ্গ দেশের [অ]বিনশ্বর সম্পত্তি।

ক্রমশঃ।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

পূর্ব্বতন কায়স্থ-সমাজ।

[গ]ত বৈশাখের "সাহিত্যে" 'মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনে'র সংবাদ [প্র]কাশ করিয়া সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কায়স্থসমাজের [বি]শেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের [উ]ক্তির ভ্রম দেখাইয়া মৈত্রেয় মহাশয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমান [ই]ংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনুধাবনযোগ্য। মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়া-

ছেন যে, "ইংরেজী শিক্ষার স্পর্শমণিসংস্পর্শে আমাদের পাল-সরকার-দাস-ঘোষ-বসু-মিত্র মহোদয়গণ হঠাৎ সুবর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিলে রচনা-লালিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালীর পুরাতত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।" "তাঁহাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহা বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ, সমগ্র হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড অভিযোগ। ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন তাহার কথঞ্চিৎ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিবে; এবং গৌড়-গৌরব-যুগের যে সকল লিপিপ্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে স্থানলাভ করিতে পারিবে।" (১) মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তির সমর্থন করিবার জন্যই আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা। এই প্রবন্ধের উপসংহারে দেখাইয়াছি যে, কেবল গৌড়বঙ্গ বলিয়া নহে, মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের ন্যায় এখানকার বহু ঘোষাদি কায়স্থসন্তান ভিন্ন দেশে ও ভিন্নরাজ্যে গিয়া দূর অতীতকালে উচ্চ রাজকীয় পদলাভের সঙ্গে স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং গৌরবজনক প্রতিপত্তির নিদর্শন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে গুপ্তসম্রাটগণের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া আসিলে তাঁহাদের প্রতিনিধি ও রাজকর্ম্মচারী কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এ সময়ের কতকগুলি তাম্রশাসন অল্পদিন হইল ফরিদপুর জেলা হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণ পাইতেছি যে, খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শত বর্ষ পূর্ব্বে ঘোষ, পালিত, সেন, দত্ত, গুপ্ত, কুণ্ড, আদিত্য প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের সকল শাসনবিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতেছিলেন। (২) পূর্ব্ববঙ্গে খড়্গ, পাল ও বর্ম্মবংশের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের বংশধরগণের পূর্ব্বাধিপত্য কতকটা হ্রাস হইলেও পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানাগমন-কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতাপ হ্রাস হয় নাই। কায়স্থ শূরবংশের রাজত্বকালে তাঁহারাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। উত্তররাঢ় ও দক্ষিণরাঢ়ের নানা স্থানে তাঁহারাই কোথাও স্বাধীনভাবে, কোথাও বা অর্দ্ধস্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতেও বহু কায়স্থ সময়ে সময়ে আসিয়া

---

(১) সাহিত্য, ২৪শ বর্ষ, ১৩২০, বৈশাখ, ৪২—৪৩ পৃষ্ঠা।

(২) Journal of the Asiatic society of Bengal 1612. PP 449—502; Inbian Antiquary, vol. XXXIX. P 206.

এখানকার কায়স্থসমাজের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। সেই সময়েই গঙ্গাতট-বর্ত্তী সিংহেশ্বর নামক স্থানে কায়স্থ শূরবংশীয় মহারাজ আদিত্যশূরের সভায় পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজিপুরুষ বাৎস্যগোত্রীয় অনাদিবর সিংহ, সৌকালীন গোত্রীয় সোম ঘোষ, মৌদগল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত, বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শন মিত্র ও কাশ্যপ-গোত্রীয় দেবদত্ত, এই পঞ্চ মহাজন আগমন করেন। ইহারই কছুকাল পরে পালবংশ উত্তররাঢ় অধিকার করেন। দক্ষিণরাঢ়ে শূরবংশের রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ইহারই অত্যল্পকাল পরে প্রবলপরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্র চোড়ের গৌড়-মণ্ডল-আক্রমণ। এই সময়েই তাঁহাদের সঙ্গে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দত্ত-বংশের অপর বীজপুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত কাঞ্চীপুর হইতে দক্ষিণরাঢ়ে আগমন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের সুপ্রাচীন কুলপঞ্জীতে বিবৃত হইয়াছে—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অনুরক্ত
কাঞ্চীপুর হইতে আইলা গৌড়।"

তাহারই কিছুকাল পরে আর্য্যাবর্ত্তে চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়। সেই চেদিপতি কর্ণদেবের অভ্যুদয়কালেই গৌতম-গোত্রজ বসুবংশের বীজপুরুষ বীরনাথ দশরথ ও সিন্ধুনাথ এই দুই পুত্র সহ গৌড়দেশে আগমন করেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ বসুবংশধরগণ বীরনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র দশরথের সন্তান। আমাদের সুপ্রাচীন কুলগ্রন্থেও লিখিত আছে—

"বীরনাথ বসু হইল দুই শিশু
দশরথ সিন্ধু নামে।"

দশরথের পূর্ব্বপুরুষগণ চন্দ্রবংশোদ্ভব চেদি বা হৈহয়বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাই দশরথ বসুর কুলপরিচয় প্রসঙ্গেও আমাদের কুলপঞ্জিকায় পাইতেছি—

"স চ চৈদ্যকুলাম্বুজঃ সোমসমঃ গৌতম গোত্রভৃৎ।"

পূর্ব্ববঙ্গে বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক চেদিপতি কর্ণদেবের দৌহিত্র মহারাজ শ্যামল বর্ম্মা অবন্তী ও গুর্জ্জরের পরমার, সোলঙ্কী প্রভৃতি অগ্নিকুলের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তৎপুত্র ভোজবর্ম্মার নবাবিষ্কৃত তাম্র-লেখ হইতে আমরা সেই পরিচয় পাইয়াছি। সেই বঙ্গাধিপ শ্যামল বর্ম্মার সময়েই রাজাদেশে গুহবংশীয় ত্রিবিক্রমপুত্র দশরথ গৌড়দেশে আগমন করেন। তাঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গেও আমাদের কুলপঞ্জিকায় রহিয়াছে—

"গুহ ত্রিবিক্রমে, তিন পুত্র ক্রমে
শুন সভে সভাজন।
দশরথ জ্যেষ্ঠ, দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ
শুচিরথ সর্ব্বশেষে।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া ইষ্ট স্মরণ লইয়া
চলিলেন গৌড়দেশে॥

দশরথ গুহ উত্তররাঢ় বা দক্ষিণ রাঢ়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। তিনি অগ্নিকুলের আত্মীয়তা-সূত্রে যাদববংশীয় পূর্ব্বাবলাধিপ শ্যামলবর্ম্মার অধিকারেই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া পূজ্য হইয়াছিলেন। তিনি অগ্নিকুলোৎপন্ন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।"

আমাদের বঙ্গীয় চারি শ্রেণীর সামাজিক কায়স্থগণের বীজ পুরুষগণ আর্য্যাবর্ত্তের বিশুদ্ধ আর্য্যশোণিত লইয়া এ দেশে উপনিবেশী। অনেকেই অবগত আছেন যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থগণ এক পিতামাতার সন্তান। আমি যে বহুসংখ্যক প্রাচীন কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা হইতে প্রমাণিত হই-তেছে, চারি শ্রেণীর মধ্যেই একগোত্রজ ও একপদ্ধতিযুক্ত আমাদের সামাজিক কায়স্থবর্গ এক পিতার সন্তান। আমি পূর্ব্বে অযোধ্যা হইতে সমাগত যে সৌকালিন-গোত্রজ সোম ঘোষের নাম করিয়াছি, তিনি উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণ-রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, এই তিন সৌকালীন ঘোষ-বংশের আদিপুরুষ। এই সোম ঘোষের পরিচয়-প্রসঙ্গে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে আছে—

"অযোধ্যা হইতে আইল সোম।
বিপ্র সাথে করি হোম॥
তস্য সুত অরবিন্দ।
সুত মহেশ মকরন্দ॥
মকরন্দ সপ্তগ্রামে।
পূজিত পিতার নামে॥
দক্ষিণে বাড়িল মান।
কন্ধার কৈল কন্যাদান॥

আমাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতেও পাইতেছি—

"সোম ঘোষবংশ গুণাবতংস মকরন্দ সুভাজন।"

এইরূপ মায়াপুরী বা হরিদ্বার হইতে সমাগত বিশ্বামিত্র-গোত্রজ সুদর্শন

মিত্র উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ, এই তিন শ্রেণীর মিত্রবংশের বীজপুরুষ হইতেছেন। উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে এইরূপ বংশপরিচয় আছে—

> সুদর্শন সুতঃসোম স্তৎসুত শম্ভুমিত্রকঃ।
> শ্রীকণ্ঠস্তৎসুতো জাত স্তৎসুত বাসমিত্রকঃ॥
> পুরুষোত্তম স্তসা পুত্রশ্চত্বার স্তসা নন্দনাঃ।
> কোচা বাচস্পতিরজ্যে বটমিত্রশ্চ মধ্যমঃ॥
> কনিষ্ঠাখ্যো নরপতিশ্চত্বার সোদরা ইমে।
> বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটো হভূন্মগধেশ্বরঃ॥
> সুদর্শনবংশকোহপি কালিদাসাখ্যমিত্রকঃ।
> গতবান্ দক্ষিণরাঢ়ে তত্রৈব খ্যাতি মাপ্তবান্॥

যাদের দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতেও পাইতেছি—

> শম্ভুমিত্র নাম সুত অনুপাম কালী আদি তিন জন।

এখন উভয় শ্রেণীর প্রাচীন কুলগ্রন্থের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি—মথুরা হইতে সমাগত মৌদ্গল্য-গোত্রীয় পুরুষোত্তমই উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র, এই চারি শ্রেণীর আদি মৌদ্গল্য দত্তবংশের বীজপুরুষ। শেষোক্ত তিন শ্রেণীতে তাঁহার বংশধরগণ বটগ্রামী দত্ত বলিয়া পরিচিত। এখন উত্তররাঢ়ীয় সমাজে তাঁহার বংশধরগণ 'দাস' উপাধিতে অভিহিত হইলেও, পুরুষোত্তমের কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত 'দত্ত' উপাধি ধারণ করিতেন। তাহা অমরা উত্তররাঢ়ীয় প্রাচীন কুলপঞ্জী হইতে পাইয়াছি—

> "মৌদ্গল্যবীজো পুরুষোত্তমাখ্যো তস্মাৎ কবীন্দ্রো কুলকারদত্তঃ।
> তস্মাৎ দত্তঃ বিক্রমনামধারী তস্মাচ্চ বিশ্বম্ভর দত্তকারী।
> তস্মাৎ গদাধরো নৈকবাকঃ তস্মাদ্দত্তদাস-দামোদরাখ্যঃ।
> তস্যাত্মজো কবিরামদাসঃ সরস্বতীপ্যাতি ভুবিপ্রকাশঃ।

উদ্ধৃত প্রমাণ অনুসারে জানিতে পারিতেছি যে, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দত্ত হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষে দামোদর দত্ত 'দাস' উপাধি গ্রহণ করেন। এই 'দাস' উপাধি সম্বন্ধে উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জীতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

> "হরিতে ভকতি বড় মৌদ্গল্য-নন্দন
> দাস বলি ডাকে তারে শুন সর্ব্বজন।"

এইরূপে এখানকার চারি শ্রেণীর কায়স্থের মধ্যে বাৎস্য-গোত্রীয় সিংহবংশ, কাশ্যপ দত্তবংশ ও ভরদ্বাজ কর প্রভৃতি বহু সামাজিক কায়স্থবংশই এক পিতার

সুস্থান হইতেছেন। প্রাচ্য ভারতের নানা বর্ণধর্ম্মের লীলাস্থল গৌড়মণ্ডল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হইতে মুসলমান ও ব্রিটীশ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও একচ্ছত্রাধীন হয় নাই। পুনঃপুনঃ বৈদেশিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে সুজলা সুফলা বঙ্গভূমি নানা খণ্ড বিখণ্ডে বিভক্ত ও সেই সকল খণ্ডিত জনপদ আবার বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী নৃপতিগণের শাসনাধীন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গাগত কায়স্থগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে এখানকার রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ পুণ্যশ্লোক এক পিতার সন্তান হইলেও একই সময়ে শূর, দেব, পাল, খড়্গ, বর্ম্ম, সেন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী নৃপতিগণের সংস্রবে ভিন্ন ভিন্ন আচার ও ধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে এবং ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন নৃপতির অধিকারে বসবাস হেতু তাঁহারা শ্রেণী-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের কুলপঞ্জী হইতে জানা গিয়াছে,—বসু, ঘোষ, দত্ত, মিত্র প্রভৃতি সামাজিক কায়স্থগণ শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ, মাথুর, শকসেন, গৌড় প্রভৃতির মূল কায়স্থ-শাখা হইতেই সমুদ্ভূত। এক্ষণে উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-ভারতে চৈত্রগুপ্ত কায়স্থগণ উক্ত মূল শাখার নামে পরিচিত হই-লেও বঙ্গাগত তাঁহাদেরই দায়াদগণ স্ব স্ব পূর্ব্বপুরুষের সম্মানবর্দ্ধক এখান-কার রাজপ্রদত্ত উপাধি অথবা রাজপ্রদত্ত কুলস্থানানুসারেই সুপরিচিত। এখানে তাঁহাদের আদি পরিচয় দিবার বিশেষ প্রয়োজন না হওয়ায় কালক্রমে অনেকেই আপন পূর্ব্ব পরিচয় বিস্মৃত হইয়াছেন। এই পশ্চি-মাঞ্চলবাসী হিন্দুস্থানী কায়স্থগণ এতদিন আমাদিগকে পর [illegible] য়া আসিয়া-ছেন। বাস্তবিক তাঁহাদের সহিত আত্মীয়তা দাবী করিবার যথেষ্ট উপ-করণ আমাদের সুপ্রাচীন কুলপঞ্জীসমূহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কেবল চৈত্রগুপ্ত কায়স্থ বলিয়া নহে, মহারাষ্ট্রের চান্দ্রসেনীয় কায়স্থবংশ-ধরগণও বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এ দেশে আসিয়া এখানকার কায়স্থসমাজে সম্মিলিত হইয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে কাশ্যপ গোত্রজ 'গুপ্ত' এবং দেবল-গোত্রীয় 'রাজ'-পদবীযুক্ত সামাজিক কায়স্থ বিদ্যমান। কুলগ্রন্থে ইঁহারা মহারাষ্ট্র-দেশাগত বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম ও উত্তর ভারতে এরূপ গোত্র ও উপাধিযুক্ত চিত্রগুপ্ত কায়স্থ নাই। বোম্বাই প্রদেশে চান্দ্রসেনীয় প্রভু কায়স্থগণের মধ্যেই ঠিক ঐরূপ গোত্র ও উপাধি এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। এ অবস্থায় প্রভুকায়স্থগণের সহিত যে দক্ষিণ-

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন দক্ষিণরাঢ়ীয় বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের মধ্যে, সামাজিক দ্বিসপ্ততিঘর কায়স্থের বিভিন্ন গোত্র ও পদ্ধতি এবং তাঁহাদের কুলপরিচায়ক সুপ্রাচীন ঢাকুরগুলির আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় বহু ক্ষত্রিয়-পরিবার বঙ্গীয় কায়স্থের সহিত মিশিয়া কায়স্থ বলিয়াই সুপরিচিত হইয়াছেন।

কেবল যে গৌড় বঙ্গেই কায়স্থের উপনিবেশ ঘটিয়াছে, তাহা নহে। অতি পূর্ব্বকালে যে সকল কায়স্থ এখানে উপনিবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যেও কেহ কেহ পরবর্ত্তিকালে রাজকীয় কর্ম্মোপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গিয়া উচ্চপদে অধিষ্ঠিত, সম্মানিত ও পরে তাঁহাদের অনন্তরবংশ তত্তৎস্থানের কায়স্থসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের হিন্দুস্থানী কায়স্থমাত্রই জানেন ও স্বীকার করেন যে, তথায় দ্বাদশ শ্রেণীর মূল কায়স্থের মধ্যে যে সকল গৌড় কায়স্থ বিদ্যমান, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের গৌড়মণ্ডল হইতে গিয়া তথায় বাস করিতেছেন। হিন্দুস্থানী কায়স্থের বিশ্বাস যে, গৌড় সেনরাজবংশ এই গৌড় কায়স্থ হইতেছেন; এবং সেন বংশের সময়ে ও তৎপরেও গৌড় কায়স্থগণ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে গিয়া তত্তৎ কায়স্থসমাজভুক্ত হইয়াছেন। আমি প্রাচীন শিলালিপি হইতেও পাইয়াছি যে, সেনবংশেরও বহুপূর্ব্বে গৌড় কায়স্থগণ সুদূর মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। মধ্যপ্রদেশস্থ রতনপুর হইতে আবিষ্কৃত ৮৬৬ সংবতে (৮০৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হৈহয়বংশীয় চেদিরাজ জাজ্জল্যদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, চেদিরাজের 'মন্ত্রণা বিষয়ে অগ্রণী ও অসম শাস্ত্রপারদর্শী' এক জন গৌড় কায়স্থ মন্ত্রী ছিলেন। উক্ত চেদিরাজের সভায় নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুসংখ্যক শ্রীবাস্তব কায়স্থ বিদ্যমান ছিলেন, তাহাও আমরা উক্ত চেদিপতি ও তৎপুত্র পৃথ্বীদেবের শিলা-প্রশস্তি হইতে পাইয়াছি। (৩) তথায় সেই প্রাচীনকালে গৌড়কায়স্থ ও শ্রীবাস্তব কায়স্থ

---

(১) Crocke's Tribes and castes of the N. W. P. Vol. U P 192.

(২) Epigraphica India Vol I p 36.

(৩) " " 30 p 42.

আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গের দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ শ্রেণীর বসুবংশের বীজপুরুষ দশরথ উক্ত চৈন্ত শ্রীবাস্তব বংশ-সম্ভূত ছিলেন।

কেবল উক্ত গৌড় কায়স্থ বলিয়া কেন? পাট্না ও শোণপুর রাজ্য এবং সম্বলপুর জেলা হইতে নবাবিষ্কৃত অনেকগুলি তাম্রশাসন হইতে সন্ধান পাইয়াছি যে, বঙ্গের ঘোষ, নাগ, দত্ত, আদিত্য, অর্ণব প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ খৃষ্টীয় ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে জনমেজয় মহাভবগুপ্ত, যযাতি মহাশিবগুপ্ত এবং তৎপুত্র ভীমরথ প্রভৃতি ত্রিকলিঙ্গাধিপতির সভায় সান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভবগুপ্তের তাম্রশাসনে "রাঢ়ায় বল্লিকন্দরবিনির্গতায়" ইত্যাদি প্রয়োগ থাকায় সন্ধান পাইতেছি যে, রাঢ়বাসী ব্রাহ্মণও রাঢ়ীয় কায়স্থের সহিত ঐ সময়ে ত্রিকলিঙ্গবাসী হইয়াছিলেন। অল্প দিন হইল, ঐ সকল তাম্র-শাসন ভারত গবমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত Epigraphica Indica নামক পত্রিকার ৯ম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রাচীন লেখমালার প্রকাশক মহাশয় তাম্রশাসন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

King Janamejaya and his successors had many Bengali Kayasthas for their Court officers. We get the names of Kailasa Ghosha, father of Vallabha Ghosha, Malla Datta, son of Dhara Datta in the Employment of Janamejaya, the names Charu Datta, Uchhaba Naga and Vallabha Naga under King Jayati and the names Sinha Datta and Mangala Datta under Bhimaratha. None but Bengali Kayasthas bear Datta, Ghosh, Naga &s. as surnames, The Uriya Karana never used such surnames. The words Datta, Ghosha, & as inseperable parts of the names of men were in use in other parts of Northern India, and such names would be borne by persons of any aud every caste. but as these words are surnames here of Kayasthas. there can be no doubt that the Kings had Bengali officers under them when they acquired territories in the forest tract of Sambalpur."

বাস্তবিক, খ্রীষ্টীয় ১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে উৎকল, কলিঙ্গ, ও দক্ষিণ কোশল হইতে যত শিলালেখ—ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গাক্ষরের পূর্ণ নিদর্শন বিদ্যমান, ইহাও বঙ্গীয় কায়স্থ-প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। এইরূপ বঙ্গীয় কায়স্থের সর্ব্বত্র গতিবিধি

ও বসবাসের পরিচয় পাইয়াছি। প্রয়োজন হইলে প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে বঙ্গীয় কায়স্থগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তির যথেষ্ট পরিচয় উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।*

শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু।

অমরতা।

[Maurice Maeterlinck এর ফরাসী হইতে।]

(১)

আমরা এক্ষণে যে নব শতাব্দীতে প্রবেশ করিয়াছি—যে শতাব্দীতে প্রচলিত ধর্ম্মগুলি বিশ্বমানব-সংক্রান্ত বড় বড় প্রশ্নের উত্তর-প্রদানে বিরত—সেই শতাব্দীতে একটি সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে একটা আকুল জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, সেটি—পারলৌকিক জীবনের সমস্যা। মৃত্যুতে কি সব শেষ হইয়া যায়? আমরা মৃত্যুর পরেও কি থাকিব—এ সম্বন্ধে কি কোন প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে? আমরা কোথায় যাইব, আমাদের দশা কি হইবে? যে ক্ষণভঙ্গুর বিভ্রমকে আমরা জীবন বলি, তাহার পর-পারে কোন্ অবস্থা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে? যে মুহূর্ত্তটিতে আমাদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া যায়, সেই সময়ে জড়-শক্তি, না চিৎশক্তি জয় লাভ করে? সেই সময় নিত্য জ্যোতির, না অসীম অন্ধকারের আরম্ভ হয়?

অন্যান্য সমস্ত সত্তার ন্যায়, আমরাও অবিনশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোনও পদার্থ একেবারে বিলুপ্ত হয়—ইহা আমরা কল্পনা করিতে পারি না। অনন্তের পার্শ্বে,—একটি 'নাস্তি' রহিয়াছে, অথবা একটি জড়-পরমাণুরও পতন হইতে পারে, বিনাশ হইতে পারে, ইহা কল্পনা করা অসম্ভব। যাহা কিছু আছে, তাহা নিত্যকাল থাকিবে, সকলই আছে, নাই বলিয়া কোন জিনিস নাই। নচেৎ আমাদের বিশ্বাস করিতে হয়—বিশ্ব-সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করিতে বাধ্য হই, সেই ধারণার সহিত আমাদের মস্তিষ্কের তিলমাত্র ঐক্য নাই। এমন কি, এ কথাও বলা যাইতে পারে, আমাদের

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস. কায়স্থকাণ্ড (বসুজ) ১ম ভাগে—এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি।

মস্তিষ্কক্রিয়া বিশ্বের উল্টা দিকে চলিতেছে; কিন্তু তাহা সম্ভব নহে; কেন, না আমাদের মস্তিষ্কের ধারণাগুলি বিশ্বেরই প্রতিবিম্বমাত্র।

যাহা বিনাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্ততঃ অন্তর্হিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবিনশ্বর জড় পদার্থের রূপান্তরমাত্র, প্রকারান্তরমাত্র। কিন্তু এই সকল অবভাসের মূলে বাস্তব সত্য কি আছে, তাহা আমরা জানি না। যে বস্ত্রখণ্ডে আমাদের চোখ্ বাঁধা রহিয়াছে, যাহার চাপে আমরা অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, ঐগুলি সেই বস্ত্রখণ্ডের অন্তর্গত বয়ন-সূত্র, আমাদের জীবনের প্রতিবিম্বসমূহ। এই বন্ধনটি খুলিয়া লইলে কি অবশিষ্ট থাকে? তাহার ও দিকে একটা বাস্তব সত্য নিশ্চয়ই আছে; এস আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করি; অথবা ঐ অবভাসগুলিও কি আমাদের নিকট নাস্তির সামিল হইয়া যাইবে?

(২)

বিনাশ অসম্ভব, মৃত্যুর পরে সমস্তই থাকিবে, কিছুই ধ্বংস হইবে না;—এই কথায় আমাদের বিশেষ কিছু ঔৎসুক্য হয় না। আমাদের জীবন ইহলোকে বাহ্য ঘটনা সকল উপলব্ধি করে, আমাদের সেই ক্ষুদ্র জীবনটির দশা কি হইবে, মৃত্যুর পরে উহা স্থায়িত্ব লাভ করিবে কি না, ইহাই আমাদের ঔৎসুক্যের বিষয়। উহাকেই আমরা আমাদের চৈতন্য বলি, "আমি" বলি। এই "আমি"র বিনাশের পর, "আমি"র পরিণাম চিন্তা করিয়া, "আমি" সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা হয়, সেই "আমি" আমাদের মনও নহে, আমাদের শরীরও নহে, কেন না, আমরা জানি, এই শরীর মন উভয়ই তরঙ্গের ন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে, অবিরাম নবীকৃত হইতেছে।

তবে কি ইহা একটি অপরিবর্ত্তনীয় বিন্দুবিশেষ, যাহা চিরপরিণামশীল আকার হইতে পারে না, বস্তু হইতে পারে না, জীবনও হইতে পারে না, প্রত্যুত যাহা আকার ও বস্তুর কার্য্য ও কারণ? বস্তুতঃ উহাকে আমরা ধরিতে ছুঁইতে পারি না, উহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না;—বলিতে পারি না, কোথায় উহা অবস্থিতি করে। উহার চরম সূত্রস্থানে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে আমরা কতকগুলি স্মৃতিপরম্পরা, কতকগুলি অস্পষ্ট ও পরিবর্ত্তনশীল ধারণা ভিন্ন আর বড় কিছু উপলব্ধি করিতে পারি না—আর সেই স্মৃতি ও ধারণাগুলি আমাদের জীবনতৃষার সহিত সংযুক্ত। উহা আমাদের ইন্দ্রিয়চেতনার কতকগুলি অভ্যাস-পরম্পরা,

পারিপার্শ্বিক ঘটনাসমূহের বিরুদ্ধে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কতকগুলি প্রতিক্রিয়া-মাত্র। মোট কথা, এই নীহারিকার মধ্যে যে বিন্দুটি সর্ব্বাপেক্ষা ধ্রুব,—সেটি আমাদের স্মৃতি। আবার এই বৃত্তিটি অনেকটা বাহিরের জিনিস বলিয়া মনে হয়, অন্যান্য বৃত্তির অনেকটা সহকারী বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ উহা আমাদের মস্তিষ্কের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষণভঙ্গুর অংশ;—এমন একটি অংশ, যাহা আমাদের স্বাস্থ্যের একটু ব্যাঘাত ঘটিলেই তখনই অন্তর্হিত হয়। এক জন ইংরাজ কবি ঠিকই বলিয়াছেন:—"উহা নিত্যতার দোহাই দিয়া [ব চীৎকার করে বটে, কিন্তু উহা আমার মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"

(৩)

তাহাতে কিছু যায়-আসে না; এই "আমি," এমন যে অনিশ্চিত, এমন-য ধরা ছোঁয়ার বাহির, এমন-যে 'উড়ো-উড়ো', এমন-যে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু [ত]বু আমাদের সত্তার এরূপ কেন্দ্রস্থানীয়, উহার প্রতি আমাদের এরূপ [বি]ষম মনের টান যে, এই ছায়ামূর্ত্তির সম্মুখে, আমাদের জীবনের সমস্ত বাস্তব [সত্]তা মুছিয়া যায়। সমস্ত অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের শরীর বা শরীরের [বস্]তু, সমস্ত সুখ ভোগ করিবে, সমস্ত গৌরবের অধিকারী হইবে, অতীব [বি]রাটভাবে বা সুসূক্ষ্মভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে; ফুল, সুগন্ধ, সৌন্দর্য্য, [আ]লোক, ঈথার, নক্ষত্র—এই সমস্তে পরিণত হইবে—ইহা আমাদের নিকট [এ]কান্তই উপেক্ষণীয়। আমাদের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইয়া ক্রমে বিশ্বজীবনের সহিত [স]ম্মিশ্রিত হইবে, বিশ্বজীবনকে বুঝিতে পারিবে, বিশ্বজীবনের উপর আধি-[প]ত্য করিতে পারিবে—ইহাও আমাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষার বিষয়। আমা-[দে]র সহজ সংস্কার আমাদিগকে বলে যে, ঐ কথার উপর আমাদের কোন [দ]রদ নাই, উহাতে আমাদের কোন সুখ নাই, উহা আমাদিগকে আমা-[দে]র "আপনাতে" পৌঁছাইয়া দেয় না; কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘটনার স্মৃতি [আ]মাদের সহগামী না হইলে, এই সকল অকল্পনীয় সুখসমূহের সাক্ষিরূপে [না] থাকিলে, আমরা "আপনাকে" চিনিতে পারি না। আমার মনের উচ্চতম [উৎ]কৃতম সুন্দরতম অংশগুলি পরমানন্দের সম্ভোগে নিত্যকাল সজীব ও [ভা]স্বর হউক বা না হউক—উহা আমার পক্ষে সমান। আর ত উহারা [আ]মার নহে, আর ত উহাদিগকে আমি চিনি না। যাহাকে আমি "আমি" [ব]লিয়া উপলব্ধি করি, সেই বিন্দুটি কোন্ কেন্দ্রে আছে, তাহা আমি [জা]নি না, আর যদিবা কোনও এক কেন্দ্রে থাকে, সেই কেন্দ্রের সহিত যে স্নায়ু-

জাল ও যে স্মৃতিজাল আবদ্ধ ছিল, মৃত্যু সেই জালের বন্ধন কাটিয়া দিয়াছে। এই বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন এবং আকাশ ও কালের মধ্যে ভাসমান হওয়ায়,—অতীব দূরতম নক্ষত্রের দশা আমার নিকট যেরূপ অপরিচিত, উহাদেরও দশা আমার নিকট তেমনি অপরিচিত।

যে সত্তাটি কোথায় আছে জানি না, এবং যাহা কোথাও সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে অবস্থান করে না—সেই রহস্যময় সত্তার মধ্যে যতক্ষণ না ঐ সকল স্মৃতির ক্ষুদ্র অংশগুলিকে ফিরাইয়া আনিতে পারি, ততক্ষণ, যাই ঘটুক না কেন—আমার নিকট উহাদের কোন অস্তিত্বই নাই। আমি যেন একটি দর্পণের ন্যায় জগতের পাশ দিয়া বিচরণ করিতেছি—ঐ জগতের ঘটনাবলী উহার উপর যতটা ছায়া ফেলে, ততটা কায়া ধরে না।

(৪)

তবেই দেখা যাইতেছে, আমাদের অমরত্বের বাসনাটিকে সূত্র-বচনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আকারে পরিণত করিবামাত্রই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়,—যেহেতু আমাদের উত্তর-জীবনের সমস্ত আশা ভরসাকে এমন একটি অংশের উপর আমরা স্থাপন করিয়া থাকি, যাহা একান্তই গৌণভাবাপন্ন ও যার-পর-নাই ক্ষণস্থায়ী। আমাদের মনে হয়, আমাদের সত্তার যাহা বিশেষ লক্ষণ—সেই সকল দুঃখ, সেই সকল ক্ষুদ্রতা, সেই সকল ত্রুটী প্রভৃতি যদি মৃত্যুর পরেও আমাদের সঙ্গে থাকিয়া না যায়, তাহা হইলে অন্য সত্তার সহিত আমাদের কোন পার্থক্য থাকে না; তাহা হইলে আমাদের সত্তাটি সমস্ত অজ্ঞাত সত্তা সাগরের মধ্যে একটি অজ্ঞান-বিন্দু হইয়া অবস্থিতি করে মাত্র; এবং তখন হইতে পর-পর যাহা কিছু তাহার পরিণতি হয়, তাহার সহিত আমাদের আর কোন সংস্রব থাকে না।

অমরত্বসম্বন্ধে যাহারা এইরূপ ধারণা করিতে বাধ্য হয় তাহাদিগকে অমরত্বসম্বন্ধে কিরূপ আশ্বাস দেওয়া যাইতে পারে? উপায় কি? —আমাদের সহজ সংস্কারই যে আমাদিগকে এই অমরত্বের আশা দিতেছে। সেই সহজ সংস্কার "ছেলে-মানসি" হইলেও অতি গভীর। ইহ জীবনে আমরা যে কয়েদীর বেড়ী পরিয়াছিলাম, অমরত্ব ঐ বেড়ী-সমেত আমাদিগকে যদি অনন্তকালের পথ দিয়া টানিয়া লইয়া না যায়, ইহজীবনে কিয়ৎবৎসর ধরিয়া যে উদ্ভট চৈতন্য আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, আমাদের তাদাত্ম্যতার অকাট্য চিহ্নস্বরূপ সেই চৈতন্য যদি ঐ অমরত্বের মধ্যে না থাকে,

তবে সে অমরত্ব আমাদের পক্ষে না থাকারই সামিল। অধিকাংশ ধর্ম্মগুলি এই কথা বুঝে; তাহারা জানে, যে সহজ প্রবৃত্তি অমরত্বলাভের ইচ্ছা করে, সেই সহজ প্রবৃত্তিই আবার এই অমরত্বকে বিনষ্ট করে। এই জন্যই, ক্যাথলিক ধর্ম্মসম্প্রদায়, সর্ব্বাদিম আশা ভরসার সূত্রস্থানে ফিরিয়া গিয়া, শুধু যে আমাদের পার্থিব "আমি" সমগ্রভাবে বজায় থাকিবে বলিয়া আমাদিগকে আশ্বাস দেয়, তাহা নহে, আরও এই আশ্বাস দেয় যে, আমরা আমাদের রক্ত-মাংস লইয়া পুনর্ব্বার উত্থান করিব।

ইহাই এই সমস্যার কেন্দ্রস্থল। এই ক্ষুদ্র চৈতন্য, এই বিশেষ আমিত্বের অনুভূতি, যাহা প্রায় শিশুবৎ অপুষ্ট, অন্ততঃ যাহা অতীব সীমাবদ্ধ,—যাহা আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের দৌর্ব্বল্যমাত্র, সেই চৈতন্যকে বুঝিবার জন্য, উপভোগ করিবার জন্য, সেই চৈতন্য অনন্তকাল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে এইরূপ দাবী করার অর্থটি কি ইহা নহে যে, আমরা এমন একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এমন একটা পদার্থ দেখিতে চাহিতেছি, যাহা দেখিবার জন্য সেই ইন্দ্রিয় গঠিত হয় নাই? আমরা হস্তের দ্বারা আলোক উপলব্ধি করিব, চক্ষুর দ্বারা গন্ধ উপভোগ করিব—ইহা কি সেই রকম দাবী নহে? তা ছাড়া, কোন রোগী যদি মনে করে, আপনাকে আবার ঠিক চিনিতে হইলে, তাহার সুস্থাবস্থাতেও, চিরদিনের জন্য তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই রোগটি থাকা চাই—ইহা কি কতকটা সেই রকমের কথা নহে? সচরাচর তুলনা যেরূপ হইয়া থাকে, সেই হিসাবে এই তুলনাটিও খুব ঠিক্। মনে কর, এক জন অন্ধ শুধু অন্ধ নহে, তা ছাড়া সে পঙ্গু ও বধির। মনে কর, জন্মাবধি তার এইরূপ অবস্থা; তার পর, এখন সে ত্রিশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। সাদা বস্ত্রের পাড়টির ন্যায় বেচারীর প্রতিবিম্বহীন ফাঁকা জীবনের প্রান্তদেশে তাহার সেই সামান্য অনুভূতিগুলি কি? তাহার স্মৃতি-পটের সুদূর পশ্চাতে, তাহার স্মৃতির মধ্যে আছে শুধু অতি তুচ্ছ তাপশৈত্যের অনুভূতি, শ্রান্তি ও বিশ্রামের অনুভূতি, অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী দৈহিক বেদনার অনুভূতি, ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভূতি। কোন দৈহিক কষ্টের উপশমে সে যে-সুখ অনুভব করিয়াছে—খুব সম্ভব, সমস্ত মানব-সুখ, সমস্ত আশা ভরসা, সমস্ত উচ্চতর কল্পনার স্বপ্ন, সমস্ত স্বর্গের ধারণা, তাহার নিকট সেই অস্পষ্ট পূর্ব্বানুভূত সুখের অনুভূতিতে পরিণত হইবে। অতএব, তাহার এই চৈতন্যের ভাণ্ডারে, তাহার

এই আমিত্বের ভাণ্ডারে, এইটুকুমাত্র সম্বল থাকাই সম্ভব। উহার বুদ্ধিবৃত্তি, বাহির হইতে কখনও কোন আহ্বান পায় নাই বলিয়া, উহা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইবে, আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারিবে না। তথাপি এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তির ক্ষুদ্র জীবনের বন্ধন, সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরই ন্যায় অমনি তীব্র, অমনি জ্বলন্ত আগ্রহপূর্ণ হইবে। সে মৃত্যুকে ভয় করিবে; নিজে হৃদয়ানুভূতিগুলিকে সঙ্গে না লইয়া, তাহার তমোরাশিকে, তাহার দারিদ্র্য শয্যার স্মৃতিগুলিকে সঙ্গে না লইয়া, তাহার নিস্তব্ধতাকে সঙ্গে না লইয়া, অসীম অনন্তের পথে তাহাকে প্রবেশ করিতে হইবে,—এই কথা মনে করিলে সে নিরাশা-সাগরে নিমগ্ন হইবে। আমরাও ঐরূপ জীবনের গৌরব, আলোক ও প্রেমের বদলে সমাধিস্থানের চির-শৈত্য ও অন্ধকারে প্রবেশ করিতে হইবে মনে করিলে নৈরাশ্য-সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকি।

(৫)

মনে কর, কোন এক অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে হঠাৎ তাহার চোখ, তাহার কাণ সজীব হইয়া উঠিল; তাহার শয্যার শিয়রের দিকের খোলা জান্‌লা দিয়া, ময়দানে উদ্ভাসিত অরুণ-কিরণ, গাছপালার মধ্যে মুখরিত বিহঙ্গ-সঙ্গীত, তরুপল্লবের মধ্যে অনিলের সরসর-শব্দ, নদীতটে জলের কুলুকুলু ধ্বনি, পাহাড়ের মধ্য হইতে মানব-কণ্ঠের স্বচ্ছ আহ্বান-রব তাহার নিকট প্রকাশিত হইল। আরও মনে কর, ঐ অলৌকিক ঘটনার প্রভাবে তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার করিতে সে সমর্থ হইল। সে উঠিল; এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের উদ্দেশে সে হাত বাড়াইয়া দিল, সে এই ব্যাপারের সদৃশ অন্য কিছু পূর্ব্বে উপলব্ধি করে নাই, উহার নাম পর্য্যন্ত সে জানে না :— উহা কি ? না, আলোক! সে দ্বার খুলিল, এই অত্যুজ্জ্বল আলোক-রাশির মধ্যে তাহার পা টলিতে লাগিল, এই সমস্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে তাহার সমস্ত শরীর যেন দ্রবীভূত হইল। সে এক অনির্ব্বচনীয় জীবনের মধ্যে এক স্বপ্নাতীত আকাশের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং এইরূপ হঠাৎ আরোগ্য-লাভের ফলে—এক অভাবনীয় ও দুর্ব্বোধ্য অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়া—যাহা একান্ত অসম্ভব নহে—সে তাহার অতীত জীবনের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে হারাইল।

এই যে "আমি", এই যে কেন্দ্রগত অভ্যন্তর, এই যে আমাদের সমস্ত অনুভূতির আধারভূমি, এই যে বিন্দুটি যাহার অভিমুখে আমাদের জীবনের যাহা কিছু নিজস্ব—সমস্তই ধাবিত হইতেছে—ইহার অবস্থা কিরূপ হইবে ? স্মৃতি লুপ্ত

হইলে—সে পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষটির কি কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাইবে? একটি অভিনব শক্তি, অভিনব জ্ঞান, হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া, অশ্রুত-পূর্ব্ব কর্ম্মচেষ্টা প্রকাশ করিতে লাগিল;—যে তমোময় জড়-বীজ হইতে এই জ্ঞান সমুত্থিত হইল, তাহার সহিত এই জ্ঞানের সম্বন্ধ কিরূপ ভাবে রক্ষিত হইবে? তাহার অতীতের কোন্ অংশের সহিত যোগ স্থাপন করিয়া তাহ'র জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিবে?

যাই হোক্, স্মৃতি-নিরপেক্ষ আর কোন সহজ-সংস্কার, কোন বুদ্ধিবৃত্তি. কিংবা আর কোন কিছু, তাহার মধ্যে থাকিবে কি না—যাহার দ্বারা সে বুঝিতে পারিবে, এই নবোদ্ভাসিত জীবনটা তাহারই জীবন,—তাহার প্রতিবেশীর জীবন নহে—রূপান্তরিত ও দুরভিজ্ঞেয় হইলেও বস্তুতঃ একই জিনিস, উহার তাদাত্ম্য অক্ষুণ্ণ—এবং তমোরাশি ও নিস্তব্ধতা হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক ও ঐকতানের মধ্যে উহা আরও কিছুকাল অবস্থিতি করিবে। এই উন্মদ চৈতন্যের বিশৃঙ্খলতা, উহার জোয়ার ভাঁটা কি আমরা কল্পনা করিতে পারি? কল্যকার "আমি"র সহিত আজিকার "আমি" কি রকম করিয়া মিলিত হইবে, এবং এই অহং-বিন্দুটি—এই ব্যক্তিত্বের চেতন-বিন্দুটি যাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি—এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, এইরূপ বিকার-অবস্থায়, সেই বিন্দুটি কি ভাবে অবস্থিতি করিবে, তাহা কি আমরা জানি?

প্রথমে সেই প্রশ্নেরই যথাযথ উত্তর দিবার চেষ্টা করা যাক্—কেন না ইহা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের ও প্রত্যক্ষ জীবনের অধিকারভুক্ত; এবং যদি আমরা তাহা না পারি, তাহা হইলে মৃত্যুকালে যে সমস্যা প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়, আমরা কি করিয়া সে সমস্যার সমাধানের আশা করিব?

(৬)

এই সচেতন বিন্দুটি--যাহার মধ্যে অমরত্বের সমস্ত সমস্যাটি নিহিত-এই রহস্যময় বিন্দুটি,—মৃত্যুর সম্মুখে আমরা যাহার এতটা মূল্য অবধারণ করি,—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই বিন্দুটিকে আমরা আমাদের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত হারাইয়া থাকি, অথচ তাহার জন্য একটুও উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা অনুভব করি না। কেবল প্রতিরাত্রি আমাদের নিদ্রাকালেই যে উহা বিলুপ্ত হয়, তাহা নহে, পরন্তু জাগ্রতাবস্থাতেও অসংখ্য ঘটনার উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে। [illegible]

একটা আঘাত, একটু অসুস্থতা, কয়েক পাত্র সুরা, একটু আফিম, একটু ধোঁয়াই যথেষ্ট। এমন কি, যখন কোন পদার্থের দ্বারা উহার পরিবর্ত্তনও ঘটে নাই, তখনও উহা সচেতন থাকে না। অমুক অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে ইহা জানিবার জন্য, অনেক সময় একটা প্রবল চেষ্টার দ্বারা, আমাদের সেই চেতন-বিন্দুটিকে আবার ধরিতে পারি,—আপনাতে আপনি ফিরিয়া আসি। একটু চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইলেই, আমাদের পাশ দিয়া একটা সুখ চলিয়া যায়, আমাদিগকে একটুও স্পর্শ করে না, সেই সুখ আমরা আদৌ অনুভব করি না। আমরা এই মনে করিয়া আশ্বস্ত হই যে, কোন আঘাতের পর, কোন ধাক্কার পর, কোন চিত্তবিক্ষেপের পর, আবার আমরা ঐ চেতন-কেন্দ্রটিকে নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইব, কিন্তু পক্ষান্তরে, আপনাকে এতই দুর্ব্বল বলিয়া আমরা অনুভব করি যে, আমাদের মনে হয় যে, মৃত্যুর ভীষণ আঘাতে ঐ চেতন বিন্দুটি হয় ত চিরকালের মত অন্তর্হিত হইবে।

ক্রমশঃ।—

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচনা।

১। সন্ধ্যাকর নন্দী।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অন্যতম প্রবর্ত্তয়িতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গত চৈত্র মাসের "সাহিত্যে" "রামচরিত"-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর জাতি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের ন্যায় [illegible]কেশ বহুদর্শী ব্যক্তির সহিত বিচার করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির শোভা পায় না, তবে ঘটনাক্রমে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজ সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিতে পারিয়া তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিত" প্রকাশকালে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি, আই, ই, মহাশয় উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "The author belonged to a very respectable family of Varendra Brahmans who derived their name from their residence in the Varendra country, i. e. North Bengal, the scene of the struggles of Ramapala, for empire. The residential village from which Sandhyakara's family derived their cognomen is Nanda, perhaps a contraction of Nandana. The family is still well known." (Memoirs A. S. B. Introduction, page 1.) মৈত্রেয় মহাশয় বলিতেছেন, "সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইলে বহুগৌরবান্বিত ব্রাহ্মণসমাজও গৌরব লাভ করিত। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী প্রবীণ পণ্ডিতের দীর্ঘকালের গবেষণা

প্রসূত হইলেও, এই সিদ্ধান্ত বরেন্দ্রের অধিবাসিগণের নিকট সংশয়শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না।"

"আত্মপরিচয়জ্ঞাপক প্রথম শ্লোকে সন্ধ্যাকর একবার "বৃহদ্বটু" শব্দের প্রয়োগ করায়, তাহাই হয় ত শাস্ত্রী মহাশয়কে ব্রাহ্মণত্ব-প্রতিপাদনে প্রণোদিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু "বৃহদ্বটু" শব্দের সহিত 'নন্দিকুলে'র সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না; নন্দিকুলের 'কুলস্থানে'রই সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মাহাত্ম্য-ঘোষণার্থ কবি বলিয়াছেন, তাহা পুণ্যভূমি, তাহাকে 'বৃহদ্বটু' বলিত। সন্ধ্যাকরের বংশ যে কখনও কোনও 'গ্রাম' হইতে 'কুলোপাধি' গ্রহণ করিয়াছিল, গ্রন্থমধ্যে সেরূপ প্রমাণ উল্লিখিত নাই। 'নন্দিরত্নসন্তানে' বরং ইহাই অনুমিত হইতে পারিত যে,—সন্ধ্যাকরের কুলোপাধির মূল ভৌগোলিক নহে, ব্যক্তিগত। সন্ধ্যাকর 'নন্দ' নামক কোনও 'গ্রামের' উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাহা 'নন্দন' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ কি না, সে চিন্তা আদৌ উদিত হইতে পারে না। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের 'নন্দনাবাসী গ্রামীন' ভট্ট দিবাকরের পুত্র কল্লুক ভট্ট বিশ্ববিখ্যাত। তাঁহারও কুলস্থানের নাম 'নন্দন' নহে; 'নন্দনাবাসী'। তাহাকে বারেন্দ্রভূমির লোকে 'নন্দনাবাসী' ই বলিত, ইদানীং সংক্ষিপ্তাকারে 'নাগুসী' বলে,—'নন্দন' বা 'নন্দ' বা 'নন্দী' বলে না। 'নান্দকুল' নামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজে কোনও কুল নাই। পক্ষান্তরে, 'নন্দিকুল' বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজের একটী সম্রান্ত কুল; তাহা অদ্যাপি সুপরিচিত। এই সকল কারণে সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত।" (সাহিত্য, ২৩শ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, পৃঃ ১৪৫—৪৬)।

শাস্ত্রী মহাশয় অবশ্য "নন্দী" ও "নন্দনাবাসী" এক মনে করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং তিনি বোধ হয় এখনও অবগত নহেন যে, "নন্দনাবাসী" এখন "নাগুসী"তে পরিণত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, মৈত্রেয় মহাশয় মুখ্য কুলীনবংশসম্ভূত, তিনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বারেন্দ্রসমাজে শাণ্ডিল্য-গোত্রে "নন্দনাবাসী" যেমন একটা গাঁই, তেমনই ভরদ্বাজগোত্রে "নন্দিগ্রামী" আর একটি গাঁই আছে। এই সংবাদটি আমি অবগত ছিলাম না, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে এক বন্ধুর গৃহে মহিমচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে বিষয়টি দেখিয়াছিলাম।

নন্দীগ্রামী গোগ্রামী চ নীপটী চ সমুদ্রকঃ।

—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, পৃঃ ৯১।

সুতরাং সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন। "করণ" শব্দে মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে কায়স্থ বুঝায়, কিন্তু "কায়স্থ" শব্দে তখন লেখক বুঝাইত কি জাতি বুঝাইত, তাহা অদ্যাপি স্থির নির্ণয় হয় নাই। "করণানামগ্রণীঃ" বলিতে সাধারণতঃ রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রধান বুঝায়। মৈত্রেয় মহাশয়ের ন্যায় বহুদর্শী পণ্ডিতের সহিত তর্ক করা আমার ন্যায় অজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব; আমার নিবেদন এইমাত্র যে "রামচরিত"-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন। তিনি যে নিশ্চয়ই কায়স্থ ছিলেন, তাহা বলা উচিত নহে।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। কৈফিয়ৎ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তখন সাহিত্য-সম্পাদকের পক্ষে আমার "কৈফিয়ৎ তলব" করা অনিবার্য্য। "অতি অল্পদিন পূর্ব্বে" তিনি "এক বন্ধুর গৃহে মহিমচন্দ্র মজুমদার * প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক গ্রন্থে দেখিয়াছেন,—"বারেন্দ্র-সমাজে শাণ্ডিলা গোত্রে নন্দনাবাসী যেমন একটা গাঁই, তেমনই ভরদ্বাজ-গোত্রে নন্দিগ্রামী আর একটি গাঁই আছে।" এই তথ্যাবিষ্কারের উপর নির্ভর করিয়া রাখালবাবু লিখিয়াছেন,—"সন্ধ্যাকর নন্দী ব্রাহ্মণ হইলেও হইতে পারেন।" কথাটা এমন সাজাইয়া গুছাইয়া রহিয়া সহিয়া বলা হইয়াছে, যেন তাঁহার এই সিদ্ধান্তই চরম সিদ্ধান্ত।

আমার কৈফিয়ৎ অতি যৎসামান্য। সন্ধ্যাকর যে ভাবে আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমার কৈফিয়ৎ। তাহা আবার উদ্ধৃত করিতে হইল। † তাহাতে "নন্দী গ্রামের" প্রসঙ্গ নাই। তাহাতে কুল-পরিচয় দিবার সময়ে "নন্দিকুল" এবং কুলোপাধির পরিচয় দিবার সময়ে "নন্দী" আছে। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে এইরূপ কুল এবং কুলোপাধি নাই, আছে বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজে। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-সমাজে "নন্দীগ্রামী" নামক গাঞী আছে বলিয়া, "নন্দীকুল" এবং "নন্দী" উপাধিও আছে, এতখানি অনুমান করিবার উপায় নাই। সন্ধ্যাকর "নন্দীগ্রামে"র উল্লেখ করিলেও না হয় একটা তর্ক উত্থাপিত হইতে পারিত। তিনি তাহা করেন নাই। বরং "নন্দিরত্নসন্তানে"র এবং "নন্দিকুলে" এবং "নন্দী" উপাধির উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। তাহার সহিত "নন্দিগ্রামী"কে" খাপ খাওয়াইতে না পারায়, এখন দেখিতেছি, সেই অপরাধে আমার "পক্ককেশের কথাও উঠিয়াছে।

সত্যনির্ণয়ই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই ঐতিহাসিক বিচারে, তর্কের জন্য তর্ক, শোভা পায় না। কুল এবং গাঞী যে এক নয়, একই কুলে যে একাধিক গাঞী থাকিতে পারে ও আছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া, "নন্দিগ্রামী" দেখিবামাত্র "পাইয়াছি—

---

* "গৌড়ে ব্রাহ্মণ"-রচয়িতা পরলোকগত। তাঁহার নাম মহিমচন্দ্র নয়, মহিমা-চন্দ্র। গ্রন্থেও সেই নামই ছাপা আছে। তাঁহার এবং তাঁহার গ্রন্থের সহিত পরিচয় ছিল; "সাহিত্যের" পুরাতন "ফাইলে" তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণও আছে।

† বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূর্ব্বৃহদ্বটুঃ ;
তত্র বিদিতে বিখ্যোতিনি নন্দিরত্ন-সন্তানে।
সমজনি পিনাকনন্দী নন্দীব নিধি র্গুণৌঘস্য ॥
তস্য তনয়ো মতনয়ঃ করণানামগ্রণী রনর্ঘগুণঃ।
সান্ধি শ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানতঃ প্রজাপতি র্জাতঃ ॥
নন্দিকুল-কুমুদ-কানন-পূর্ণেন্দু র্নন্দনোঽভবত্তস্য।
শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী পিশুনান্নন্দী সদানন্দী ॥

পাইয়াছি" বলিয়া, তাহাকেই নন্দিকুলের প্রমাণরূপে খাড়া করিয়া তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইলে "কুম্ভকর্ণে ভকারোঽস্তি" যে শ্রেণীর তর্কপ্রণালী, সেই শ্রেণীর তর্কপ্রণালীর প্রশ্রয় দান করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তাহার ছড়াছড়ি হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত, এবং অনেকের শিক্ষক হইয়াছেন। তাঁহার নিকট আমরা অন্যরূপ বিচারপ্রণালীর আশা করি।

রাখালবাবু অবলীলাক্রমে লিখিয়াছেন,—"করণানামগ্রণীঃ" বলিতে সাধারণতঃ রাজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে প্রধান বুঝায়।" কেন বুঝায়, তাহা বুঝাইয়া দেন নাই। সন্ধ্যাকরের কাব্যেই "করণা"-শব্দ দেখিয়াছি;—আর কোনও গ্রন্থে দেখি নাই। রাখালবাবু যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে "অসার্থ" লিখিয়াছেন, তাহাতে স্বতই মনে হইতে পারে, তিনি যেন এরূপ প্রয়োগ অনেক স্থলেই দেখিয়াছেন। দুটি একটি দেখাইয়া দিলে প্রীত হইতাম।

আমি দুইটি কথা বিশেষভাবে লিখিয়াছি। (১) সন্ধ্যাকর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, শাস্ত্রী-মহাশয়ের এই সিদ্ধান্ত বরেন্দ্রের অধিবাসিগণের নিকট সংশয়শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে না। (২) "সন্ধ্যাকর নন্দীকে কায়স্থ বলিয়া ঠিক করাই সহজ, এবং যুক্তিসঙ্গত।" আমার কথা দুইটির অনুকূলে যাহা বলিবার ছিল, বলিয়াছি। সিদ্ধান্ত যদি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিব। আমার মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে শাস্ত্রী-মহাশয়ের সঙ্গে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তিনি জীবিত আছেন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে প্রধান পরিচালকের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। আমার ভুল হইয়া থাকিলে, তিনি নিজেই তাহার সংশোধন করিয়া দিবেন। অলমতিবিস্তরেণ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

৩। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন।

গত পৌষ মাসে শ্রীহট্টজেলায় নিধনপুর গ্রামে কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান বৎসরের আষাঢ় মাসের দুইখানি বাঙ্গালা মাসিকপত্রে তাহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত এচ, ই, ষ্টেপলটনের নিকট ফটোগ্রাফ পাইয়া "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" সম্পাদকের অনুরোধে উক্ত পত্রিকায় তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি ইংরাজী প্রবন্ধ ও তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ বর্ত্তমান বর্ষের আষাঢ় মাসের "বিজয়া" পত্রিকায় এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ ও তৎকর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তাম্রশাসনখানি চারি সপ্তাহ কাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট ছিল, এবং সেই সময়ে ইহার "পাঠোদ্ধার কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে।" তাম্রশাসনখানির বর্ত্তমান মালিক কে, তাহা দুই প্রবন্ধের

কোনটিতেই স্পষ্ট কথিত নাই। মালিকের অনুমতি অনুসারে প্রবন্ধ দুইটি লিখিত হইয়াছিল কি না, তাহাও বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মালিকের অনুমতি ব্যতীত বা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও তাম্রশাসন সম্বন্ধে কোনও কথা প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের Treasur Trove আইন অনুসারে প্রণীত নূতন নিয়মাবলীর মধ্যে ইহা পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আসাম গবর্মেণ্ট ইহার মালিক, এবং আসাম গবর্মেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারিবর্গের অনুমতি ব্যতীত অপর কেহ ইহা প্রকাশ করিতে পারেন না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ আসাম গবর্মেণ্টের Civil List এর পৃষ্ঠায় উক্ত প্রদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারিগণের নাম দেখিতে পাইবেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের সহিত কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে মুদ্রণের দোষে অক্ষরগুলি স্পষ্ট হয় নাই। অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠের সহিত অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া দেখিলাম যে, স্থানে স্থানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু মূল তাম্রশাসন বা তাহার প্রতিলিপির অভাবে পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোনও কথা বলা অসম্ভব।

অধ্যাপক বসাক ও ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পাঠ অবলম্বন করিয়া কামরূপ ও বঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতেছি। তাম্রশাসনখানি অসম্পূর্ণ, ইহার তৃতীয় ফলকখানি হারাইয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাতে কোনও তারিখ নাই। ইহাতে কথিত আছে যে, ভাস্কর বর্ম্মা কর্ণসুবর্ণ বাসক হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এবং ইহাতে তাঁহার উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম আছে। ইহার শেষ শ্লোকে কথিত আছে যে, অগ্নিদাহে মূল তাম্রশাসন নষ্ট হইলে নূতন তাম্রশাসন লিখিত হইয়াছিল, বা ইহা কূটশাসন অর্থাৎ কৃত্রিম নহে। নূতন তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় ভাস্কর বর্ম্মার নিম্নলিখিত বংশপরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে :—

অমিনা।
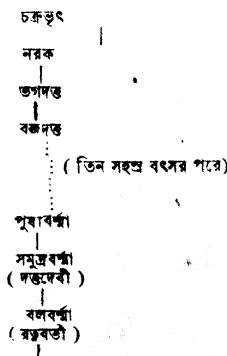
চিত্রকর উইলিয়ম ওণ্টনর।

Block and Printed by the Mohila Press Calcutta.
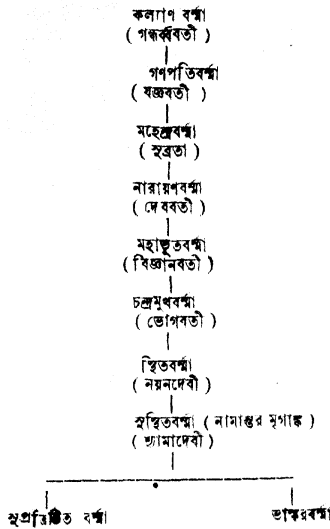
অদ্যাবধি কামরূপরাজগণের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা ভগদত্তের বংশজাত, কিন্তু নূতন তাম্রশাসনে যে কয় পুরুষের নাম পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোনটিই পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। নূতন তাম্রশাসনে যতগুলি নাম আছে, তাহার মধ্যে দুইটি মাত্র ইতিহাসে সুপরিচিত। গৌহাটীতে আবিষ্কৃত ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে এবং তেজপুর ও সুয়ালকুচিতে আবিষ্কৃত রত্নপালের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপরাজগণের আর এক শাখার নিম্নলিখিত বংশ-পরিচয় পাওয়া যায় :—

হরি
|
নরক
|
ভগদত্ত
|
বজ্রদত্ত
|
|
|
ব্রহ্মপাল
|
রত্নপাল
|
পুরন্দরপাল
|
ইন্দ্রপাল

তেজপুরে আবিষ্কৃত বনমালের তাম্রশাসন ও নওগাঁয়ে আবিষ্কৃত বলবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে ভগদত্তবংশীয় কামরূপ রাজগণের তৃতীয় শাখার নিম্নলিখিত বংশ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দেব গোস্বামী ধর্ম্মপালদেব নামক এক জন নূতন কামরূপ-রাজের একখানি নূতন তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বংশ-পরিচয় তিনটি ভগদত্ত বংশের একই শাখার কি ভিন্ন ভিন্ন তিনটি শাখার, তাহা স্থির করিবার কোনও উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই।

কর্ণসুবর্ণ শ্রীযুত বেভারিজ সাহেবের মতে মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটী গ্রাম। চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিওয়েন থসং বা য়ুয়ন চুয়াং কর্ণসুবর্ণকে বঙ্গদেশের চারিটি বিভাগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে আর 'কিছুই জানা যায় নাই। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক তাঁহার ইংরেজী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমরা গঞ্জামে আবিষ্কৃত কলিঙ্গরাজ মাধববর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, শশাঙ্ক কর্ণসুবর্ণের রাজা ছিলেন।" We know from the Ganjam copper plate inscription of the Kalinga King Madhava Varman (Gupta era 300, i. e. 619 A. D.) that the ruler of Karnasuvarna was Sasanka."—Dacca Review, June, 1913 P. 5. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ বসাকের ন্যায় দেশবিখ্যাত বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কিরূপে এ কথা বলিলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। গঞ্জামে আবিষ্কৃত মাধববর্ম্মার তাম্রশাসনে কর্ণসুবর্ণের নাম পর্য্যন্ত নাই।

ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সুস্থিত বর্ম্মা ভারতের ইতিহাসে একেবারে অপরিচিত নহেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক বা পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ কেহই সুস্থিতবর্ম্মার পূর্ব্বপরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। মগধরাজ আদিত্যসেনের

পিতামহ মহাসেন গুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। সে সুস্থিতবর্ম্মা যে ভাস্কর বর্ম্মার পিতা সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত সুস্থিতবর্ম্মার পুত্র ভাস্কর বর্ম্মার ন্যায় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। ইহাই প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আপসড্ শিলালিপির যে শ্লোকে মহাসেনগুপ্তের সহিত সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার পরের শ্লোকেই কথিত আছে যে, মহাসেনগুপ্তের যশ লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র তটে গীত হইত :—

শ্রীমহাসেনগুপ্তোঽভূৎ তস্মাদ্বীরাগ্রণীঃ সুতঃ।
সর্ব্ববীরসমাজেষু লেভে যো ধুরি বীরতাং॥
শ্রীমৎসুস্থিতবর্ম্মযুদ্ধবিজয়শ্লাঘাপদাঙ্কং
মুহুর্যাস্যাদ্যাপি বিবুদ্ধ কুন্দ কুমুদকুসুমাচ্ছ হারতং
লৌহিত্যস্য তটেষু শীতলতলেষু ৎফুল্লনাগদ্রুমচ্ছায়া
সুপ্ত বিবুদ্ধ সিদ্ধমিথুনৈঃ স্ফীতং যশোগীয়তে॥

—Fleet's Gupta Inscription, p. 203.

কর্ণসুবর্ণ বাসকের উল্লেখ দেখিয়া অধ্যাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য মনে করিয়াছেন যে, তাম্রশাসন দ্বারা প্রদত্ত গ্রামখানি কর্ণসুবর্ণ প্রদেশে অবস্থিত ছিল। যে স্থান হইতে তাম্রশাসন প্রদান করা হইয়াছে, প্রদত্ত ভূমিও যে সেই স্থানের নিকটে অবস্থিত হইবে, তাহার কোনই কারণ নাই। গাহড়বাল বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দেব মুদ্গাগিরিসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে গঙ্গাস্নান উপলক্ষে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহা মগধ বিষয়ে অবস্থিত ছিল না। হর্ষচরিতে ও য়ুয়ান্ চুয়াঙের বিবরণে ভাস্কর বর্ম্মার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নূতন তাম্রশাসন হইতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম স্থির হইল মাত্র। ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় হর্ষবর্দ্ধনের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য হর্ষবর্দ্ধন গৌড়াধিপ শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, ভাস্কর বর্ম্মা বোধ হয় তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। কামরূপ রাজগণের সহিত মগধ ও বঙ্গের গুপ্তরাজগণের পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। মহাসেনগুপ্তের সহিত সুস্থিত বর্ম্মার ও শশাঙ্কের সহিত ভাস্কর বর্ম্মার বিবাদের ইঙ্গিত দেখিয়া ইহাই মনে হয়। শশাঙ্কের অপর নাম বোধ হয় নরেন্দ্রগুপ্ত। সম্ভবতঃ তিনি মগধের গুপ্ত-রাজবংশজাত, এবং মহাসেনগুপ্তের নিকট আত্মীয় ছিলেন।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

———

মৃত্যু তোরে মাগে।

১

ওহে দেব! কেন পুনঃ শান্তি ল'বে কেড়ে?
কেন পূজা পুনরায় আঁধার মন্দিরে?
আবার দেখালে কা'রে? হের, প্রভু, হের—
স্ফটিক ললাট তার, রক্ত ওষ্ঠাধর;
অপরূপ রূপরাশি, কি দিব তুলনা;
হে সুন্দরী! তুমি শুধু তোমারই উপমা!
কেশে বেশে বক্ষোদেশে পুষ্পের আঘ্রাণ,
কণ্ঠে তব মহাবাণী—মহা প্রাণ-গান!
বেণু বীণা ফেলে দিয়ে তুলেছ দুন্দুভি,
ঝঞ্ঝাবায়ু বহি' আনে তোমার সুরভি।

নিদাঘ-সন্ধ্যায় আজ ক্ষণে ফিরে চাও,
আমায় কেড়েছ যদি, আরও কেড়ে নাও;
তুমি বা হাসিলে শুধু আধেক অধরে—
ঐ হাসিটুকু আলো আমার আঁধারে!

২

হায় নিদ্রা, হায় শান্তি, হায় রে জীবন!
হা আমার মূঢ়, মূক, মলিন যৌবন!
আবার উঠিল ঝড়—আঁধার করিয়া,
সকল বন্ধন বাধা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া;
একবার খুঁজেছিলি আলো আলেয়ার—
এবার কোথায় যাবি হৃদি রে আমার!
রে পথিক প্রাণ! কার মুগ্ধ করি গান
নিশির ডাকের মত ডাকে তোর নাম।
উঠিলি আসন ছাড়ি' ফেলিয়া সাধনা—
বক্ষে আঁকড়িয়া ধরি' অসীম বেদনা।

তারে যদি দিবি পূজা, চল্, তবে চল্,
ছিঁড়ে লয়ে হৃদয়ের রক্ত জবাদল।
ওরে মূর্খ, নহে প্রিয়া,—মৃত্যু তোরে মাগে,
বংশী সম—মধু-কণ্ঠে—মধু অনুরাগে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

উলা বা বীরনগর।

৩

কাগজে ছাপাইয়া জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

প্রশ্ন—"এতকাল পরে আবার উলার কথা কেন ?"

উত্তর—"ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি !"

সে কালের সমাজের রীতি নীতি ও সে কালের ভদ্রলোকদিগের ধরণ ধারণের কথা উলা উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছি।

উলার পাগল, গুপ্তিপাড়ার বাঁদর,
আর হালিসহরের—তেঁদড়া।

উলা পাগলের জন্য প্রসিদ্ধ।

পোল পাগল পুলো,
তিন নিয়ে উলো।

উলার বামনদাস বাবু অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্রিয়াবান্ ও নিষ্ঠাবান্, এবং বিলক্ষণ গম্ভীর প্রকৃতির। বাড়ীতে বৃত্তিভোগী এক জন কবিরাজ মহাশয় থাকিতেন। মুখ হাত ধুয়ে বামনদাস বাবু বাহিরে বসিলে, এবং তিনি বলিলে, কবিরাজ মহাশয় হাত দেখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতেন। এক দিন হাত দেখিয়া তিনি বলিলেন, "এমন কিছু নহে, তবে যৎকিঞ্চিৎ বায়ুর প্রকোপ বটে।" বামনদাস বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওটুকু ত গ্রামের, আমার কি বলুন।" সুতরাং গ্রামের দুর্নাম গ্রামের লোকই স্বীকার করিতেন।

এক জন পাগলের কথা বলি;—গ্রামের প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে কুলীনসন্তান, একটু দুষ্টবুদ্ধিও বটে, একটু ভালমানুষও বটে, পেসা পাগলা, এই উপাধি পাইয়াই পাগল বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহার একটা অনুমান-খণ্ডের কথা বলি। প্রসন্ন বাঁড়ুয্যে বলিয়াছিল, "যখন রাণাঘাটের শ্রীগোপাল পাল চৌধুরী বাবুর পাগল হাতীটার মাথা গরম হইয়াছে, তখন আমাদের বামনদাস বাবু আর রক্ষা পান না।" একবার প্রসন্ন গোরুর গাড়ীতে চড়িয়া শান্তিপুর যাইতেছিল। তখন প্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল শান্তিপুরের ডেপুটী। তিনিও সেই পথে পাল্‌কী করিয়া আসিতেছিলেন; গোযানে শয়ান প্রসন্নকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে! পাগল, বামুন হয়ে গোরুর গাড়ীতে চড়েছিস্ যে ?" প্রসন্ন উত্তর করিল, "বলি—খাওয়ার চেয়ে চড়া ভাল নয় কি ?"

এই প্রসন্নর একটু গান-শক্তি ছিল, সেই জন্য লোক আরও চিনিত।

উলার সেই সময়ের আর এক জন প্রসিদ্ধ লোক শ্রীমোহন মুখুয্যে। তাঁকে সকলেই 'ছিরে থ্যাপা' বলিত। তিনি এক জন হরবোলা ও ভাঁড়। এখন যেমন কলিকাতায় গোপাল সিং ও গোস্বামী, তখন মফস্বলে ঐ রকম অনেক লোক ছিল। তাহারা নানাপ্রকার পশু পক্ষীর বুলি বলিতে পারিত, এবং কবি, কীর্ত্তন, জজের বিচার প্রভৃতি হাস্যকর পদার্থ অবিকল নকল করিত। শ্রীমোহন হাতীর ডাক পর্য্যন্ত উত্তম ডাকিতে পারিতেন, সেই জন্য তাঁহার নাম ছিল "হাতী পঞ্চানন"! রাণাঘাটে এক জন ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল "বলদ পঞ্চানন"। নিজে বেশ স্থূলকায় ও লম্বা চৌড়া শরীর ; তার উপর হাতী ডাকিতে পারিতেন বলিয়া, উলার দক্ষিণপাড়ার বারইয়ারী পূজার মহিষ-বলিদানের সময়, হাড়ীকাট-সংলগ্ন মহিষের উপর দাঁড়াইয়া ঘোর গম্ভীর চীৎকারে বৃংহিত ধ্বনি করিতেন। মহিষ বেচারা একে হাড়িকাষ্ঠে আড়ষ্টবদ্ধ, তাহার পর পৃষ্ঠে হস্তী চড়িয়াছে মনে করিয়া, একেবারে নিশ্চল হইত। তখন সহজেই তাহার মুণ্ডচ্ছেদ হইত।

শ্রীমোহন একবার দিনাজপুরের রাজবাটীতে ভাঁড়ামী করিতে যান। বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই রাজা রাজড়ার বাটীতে তাঁহার গতিবিধি ও বাৎসরিক বৃত্তি ছিল। দিনাজপুরে অনেক ভাল ভাল হিন্দুস্থানী ভাঁড় উপস্থিত ছিল। তাহারা এ বিষয়ে খুব দক্ষ লোক। অনুকরণ-নাট্যে বিশেষ পটু। সেবারে মহারাজ পর্য্যন্ত শ্রীমোহনের কৌতুক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শুনিলেন, দেখিলেন। তাহাতে হিন্দুস্থানী ভাঁড়েরা মনে মনে একটু চটিল। শ্রীমোহনের সুদীর্ঘ পালা শেষ হইলে পর, শ্রীমোহন মজলিসের এক পার্শ্বে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। হিন্দুস্থানী ভাঁড়েদের এক জন সহিস্‌বেশে মজলিসের রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। হাতে এক গাছি মোটা দড়ী, যেন ঘোড়া পালাইয়াছে, খুঁজিতেছে—"মেরি ঘোড়ী কাঁহা গয়ী রে, মেরি ঘোড়া কাঁহা গয়ী রে!" বলিয়া শ্রীমোহনের কাছে গিয়া, "এহি মেরি ঘোড়ী" বলিয়া শ্রীমোহনের কাঁধে হাত দিল। শ্রীমোহন ঘোড়ার মত চতুষ্পদ হইয়া সেই নকল সহিসের বক্ষে এক উল্টা চাট্‌ মারিলেন। সে বিষম আঘাতে দশ হাত তফাতে ধরাশায়ী হইল। মহা গোল হইতে লাগিল, মহারাজ মিটাইয়া দিলেন।

শ্রীমোহন আপনিই কবির চোতা ধরিতেন, (অর্থাৎ Promter হই-তেন) গান গায়িতেন, ঢোলে কখন কেবল সাথ করিতেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডুক্কা বাজাইতেন, আবার হঠাৎ মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া দৌড়িয়া এক কোণে গিয়া বাহবা দিতেন। শ্রীমোহন একলাই এক শ। রাণাঘাটের প্রসিদ্ধ নীলকমল পাল চৌধুরীর কৃষ্ণনগরের জজের কাছে বিচার শ্রীমোহন অভিনয় করিতেন—অবশ্য একাই জজ এবং আসামী ইত্যাদি। সকলে নীলকমল বাবুকে বলিয়া দিয়াছে, "আপনি ত কোনও পাপে নাই, আপনি জজের সকল কথায় সায় দিবেন, আপনার ভয় কি?" জজ অতি বিকট স্বরে রুক্ষ ভাবে বলিলেন, "নীলকমল পাল চৌধুরী, তৌম বড়া বদ্‌মায়েস্ হ্যায়।" নীলকমল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে অতি-ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছেন, "হাঁ হুজুর, হাঁ, হাম্ বড় বদ্‌মায়েস্ হ্যায়।" আসামী খাম্‌কা স্বীকার করে, জজ্ সাহেবের ইচ্ছা নহে; তিনি কাজেই একটু নরম হইয়া বলিলেন—"টৌম্ বড়া সাচা!" নীলকমল পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্নকণ্ঠে হাত জোড় করিয়া বলিলেন, "হাঁ হুজুর! হাম্ বড়া সাচা।" জজ্ নীলকমল বাবুকে নামাইয়া দিয়া মোকদ্দমার সাক্ষী ডাকিতে বলিলেন।

শ্রীমোহন পশু পক্ষীর স্বর উত্তম অনুকরণ করিতে পারিতেন; ভাল ছায়াবাজী দেখাইতেন। রাত্রিকালে কেবলমাত্র হস্তের সাহায্যে অল্প-ভিজা চাদরের উপর, কত পশু পক্ষী নর নারীর অবয়ব দেখা-ইতেন। এখন সায়েন্স-বলে আমরা বলীয়ান হইয়া বায়োস্কোপ দেখি—দেখ দেখি, কত উন্নতি ও কিরূপ উন্নতি!

সেই সময়কার উলার আর এক জন 'কেষ্ট বিষ্ণু'—রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য বা "মুনকে রঘুনাথ"। এমন প্রসিদ্ধি ছিল যে, তিনি 'জলে স্থলে' সর্ব্ব-প্রকারে এক মণ জিনিস আহার করিতে পারিতেন। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, দরিদ্র নহেন, কেবল আহার করিবার পারিতোষিক রূপে তাঁহার নানা স্থানে বৃত্তি ছিল, তবু একবার দেনার দায়ে তাঁর কয়েদ হয়। দুই তিন দিন জেলে অনাহারে আছেন। ⁄০ এক আনা খোরাকীতে তাঁর কি হইবে! তৃতীয় দিনে জেলর বিচারপতিকে জানাইল—রঘুনাথকে তলব হইয়া জিজ্ঞাসায় রঘুনাথ বলিলেন, এক আনা পয়সায় তাঁহার খোরাকী হইতে পারে না।" জজ বলিলেন, "কত হইলে হয়?" রঘুনাথ বলিলেন,

"অন্ততঃ এক টাকা চাই।" ডিক্রীদারের নিকট হইতে তাই দেওয়ান হইল। রঘুনাথ রক্ষীদের সঙ্গে গিয়া নিজে বাজার করিয়া আনিলেন— ./৫ সের চাউল, ./২ সের দাইল, একটা ./৫ সের রুই মাছ—ইত্যাদি। স্বহস্তে রন্ধন করিলেন, রুয়ের মুড়াটা আস্তই রাখিয়াছেন, চিরিয়া দেন নাই। আহারের সময় জজ সাহেব দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন। পঞ্চগণ্ডূষ করার পর দাইল দিয়া ২।৪ থাবা ভাত খাইয়া ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া, ./৫ সের রুয়ের মুড়িতে কামড় দিয়া কড়মড় করিয়া মুড়ি ভাঙ্গিতে লাগিলেন! জজ সাহেব সেই ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, "হামকো মৎ খাও বেটা, ডোসরা মুদ্দই হাজির, উস্‌কো খাও।" বলিয়া বগী হাঁকাইয়া কাছারীতে চলিয়া গিয়া বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে প্রত্যহ ১৲ করিয়া খোরাকী দিতে পারিবে কি না? সে পারিবে না বলাতে আসামীকে খালাস দিলেন। মুক্ত হইয়া রঘুনাথ উলায় চলিয়া আসিলেন।

এরূপ কত গল্প প্রচলিত ছিল'। বর্দ্ধমানের মহারাজ রঘুনাথকে বলিয়াছিলেন, "ভট্টাচার্য্য! ঐ কাঁটালটি সেবা করুন।" ভট্টাচার্য্য রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, সমস্ত কাঁটাল খোসা ভূতুড়ি সমেত উদরস্থ করিলেন। অদ্ভুত আহারের জন্য বর্দ্ধমান হইতে তিনি বিশেষ বৃত্তি পান।

আমি যখন রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যকে দেখিয়াছি, তখন তিনি প্রৌঢ়বয়স্ক। বয়স ষাইটের কাছাকাছি। তখন ঐ সকল গল্প, গল্পের মতই শোনা যাইত। তখন তিনি সাধারণ জনগণ হইতে কিছু বেশী খাইতেন মাত্র। আমাদের চুঁচুড়ার বাড়ীতে একবার আহার করেন। পিতৃদেব আহার দেখিয়া বলিলেন, "কৈ, আপনার আহারের যে এত গল্প শুনিয়াছি, তার ত কিছুই দেখিলাম না।" উত্তরে ভট্টাচার্য্য বলেন, "গঙ্গাচরণ বাবু, আমি যে অন্ন লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যদি রয়ে বসে খেতাম, ত বোধ হয়, ৫০ বৎসর জীবিত থাকিতাম—তখন তা ত বুঝি নাই, এখন একটু বুঝিয়াছি, তাই আর বাড়াবাড়ি করি না।"

রঘুনাথের সে সময়ে ভূষণ ভট্টাচার্য্য বলিয়া একটি পালয়ান পুত্র ছিলেন, আরও পুত্র কন্যা ছিল। ভূষণ বীরপুরুষ, তাই তার কথা বলিয়াছি!

তখন দেশে ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল। এখনকার মত ব্যায়াম নহে। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে ঠিক দুপুর রৌদ্রে যুবকেরা ব্যায়াম করিত। ব্যায়াম ফুরাইল—অমনি ট্রামে উঠিয়া বৌবাজারে চলিয়া গেল ব্যায়াম করে, অথচ এক পোয়া পথ চলিতে পারে না, তখন এমন বিড়ম্বনা ছিল না। তখন যাহারা ব্যায়াম করিত, তাহারা দুই দশ ক্রোশ চলিতে গাড়ী পাল্কী ভাড়া দিত না। উলাতেও বেশ ব্যায়ামচর্চ্চা ছিল। ভূষণ ভট্টাচার্য্য এক জন পালয়ান ছিলেন। পালয়ানীর পরীক্ষা হইত জন্মোৎসবের সকাল বেলা, আমাদের কাছারীর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে। মাঠের পূর্ব্বে আমাদের ভাড়াটিয়া দোতালা বাড়ী, সেইখানে আমাদের বাড়ীর মেয়েরা দেখিতেন। উত্তরে মাঠে কাছারীর আটচালা, সেইখানে ভদ্রলোকেরা বসিতেন; পশ্চিম দিকে সদর রাস্তা, এবং তাহার পশ্চিমে অনেকটা খোলা জমী, এই রাস্তায় ও জমীতে লোকে লোকারণ্য। দক্ষিণ দিকে শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও মন্দিরের আচ্ছাদনস্বরূপ সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ, সেই গাছের উপর পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা।

পালয়ানেরা জাঙ্গিয়া আঁটিয়া, এবং সঙ্গের ছেলের দল, গায়ে কাদা মাখিয়া

জয় নন্দলালকি!

বলিয়া, মহা গান করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত। কতকটা জল ঢালিয়া দেওয়া হইল, ছেলেরা নাচিতে ও লাফাইতে লাগিল। তাহার পর লাঠীখেলা হইল। শেষে কুস্তি।

তখনও ভূষণ প্রভৃতি লম্বা কোঁচা কাপড় পরিয়া দণ্ডায়মান। পিতৃদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এইবার ভূষণ এসো হে।" ভূষণের প্রতিদ্বন্দ্বী বীর বকো মাল। ভূষণ জাঙ্গিয়া পরিয়া, বাহুতে মাটী লাগাইয়া মল্লবেশে উপস্থিত। বকোও সেইরূপ বেশে অন্য দিক দিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিল। সেলাম, কুর্নিস, বাউকসাকসি, বাহ্বাস্ফোট, উরুস্ফোট, কত কি হইতে লাগিল; তাহার পর মাটীতে পড়িয়া কস্তাকস্তি, কেহই অপরকে চীৎ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না। একবার আমার মনে পড়ে, ভূষণ ভট্টাচার্য্য বকো মালের মাথায় এমন ঢু মারিল যে, মাথা ঝাঁ করিয়া উঠিল, বকো বসিয়া পড়িল, মাথায় গামোছা বাঁধিল; একটু ম্রিয়মাণ হইল, আমিও হইলাম। খেলা সেবারে ভাঙ্গিয়া গেল—আমি ম্রিয়মাণই

রহিলাম। কতক্ষণ পরে খবর আসিল, বকো বাজারে গিয়া মদ্ খাই-তেছে। সকলে হাসিতে লাগিল, আমি কিন্তু ম্রিয়মাণই রহিলাম।

এই সকল মাল, ভাঁড়, খাইয়ে, বা পাগলের কথা বলিলাম বলিয়া এমন কেহ মনে করিবেন না যে, উলায় সম্ভ্রান্ত বা পণ্ডিত লোকের অসদ্ভাব ছিল। উলার বামনদাস বাবু বা শম্ভুনাথ বাবু বড়মানুষ বলিয়া যে 'অবুতবু গিরিসুতো' গোছ অকর্ম্মণ্য ছিলেন, তাহা নহে। বিশেষ কর্ম্মঠ এবং চৌকোশ লোক ছিলেন। বৃহৎ পরিবার, ছোট ছোট ছেলে মেয়েই ছিল বিশ ত্রিশটি। বামনদাস স্নানের পূর্ব্বে ইহাদের প্রত্যেকটিকেই একবার কোলে লইতেন, নাম ধরিয়া সোহাগ করিতেন, সম্পর্ক ধরিয়া বিদ্রূপ করিতেন। এখনকার কালে কয় জন বড়লোকে তা পারেন? শম্ভুনাথ যাত্রা মহোৎসবাদির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সেই বৃহৎ গুম্ফজোড়া খাড়া হইয়া উঠিত। শান্তিপুরে একবার পাল্কী করিয়া শম্ভুনাথ বাবু যান; সেখানকার এক জন দুষ্ট মেয়ে বলিয়াছিল, "দিদি, দেখে যা, পাল্কীর মধ্যে একজোড়া গোঁপ যাইতেছে।" শান্তিপুরের মেয়েরা এবং উলার পুরুষেরা বড় রসিক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উলার এক জন রসিক পুরুষের পরিচয় দিতেছি। মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের এক জন সভাসদ্ ছিলেন। সকল রূপ বিদ্রূপ চলিতে পারে বলিয়া, মহারাজ মুক্তিরামের সহিত 'বেহাই' সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন। সর্ব্বদাই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেন। উলায় বহুতর কুলীনের বাস, এই জন্য নানা বিদ্রূপ চলিত। হরুঠাকুরের কবির দলে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাতেই ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী দল গায়িয়াছিল,

"এরা সব্ কুলীনের, সব্ কুলীনের ছেলে,
এদের গাল দিব কি বলে?"

এরূপ কথা কুলীনদের বিরুদ্ধে সে সময়ে সর্ব্বদাই চলিত। মহারাজও করিতেন। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র একটি গালি স্থির করিয়া, মুক্তিরাম সভায় প্রবেশ করিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ হে! বেহাই, তোমাদের উলায় নাকি বৌ বিক্রয় হয়?" মুক্তিরাম অমনই হাসিয়া উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ, নিয়ে যাওয়া মাত্রই।" সকলেই হাসিয়া উঠিল, মহারাজ নীরব।

একদিন মুক্তিরাম মুখুয্যে ভাল মাগুর মাছ পাইয়া মহারাজকে পাঠাইয়া দেন। মহারাজ সামান্য জিনিসও আহ্লাদ করিয়া লইতেন। মহারাজ মাগুর মাছ পাইয়া বড় সন্তুষ্ট, ততোধিক সন্তুষ্ট একটি গালি দিবার পন্থা বাহির করিয়া।

এখন মাগুরের শেষের র বাদ দিলেই মাগু হয়, স্ত্রীকে বুঝায়। তাই মুখুয্যে আসিবামাত্রই মহারাজ বলিলেন, "ওহে বেহাই, ও বেলা কি পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহার অন্ত পাই নাই।" মুক্তিরাম বুঝিলেন, ব্যাপার কি! বলিলেন, "মহারাজ, আমাদের পাগলের দেওয়া জিনিস, উহার আদি অন্ত দুই-ই ছিল না।" রাজা মুখের মত হওয়াতে বলিলেন, "বটে বটে।" 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—এই সকল হাসি মস্করার এই পর্য্যন্ত থাকাই ভাল।

বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে উলা বিশেষ দ্রব্যসম্ভার দিয়াছে, এবং বিশেষ ছাপ পাইয়াছে। সেই দুর্গাপ্রসাদ হইতে এই চন্দ্রশেখর বসু পর্য্যন্ত সকলেই উলার অঙ্কনন্দন। যদি বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীন দশ জন লেখকের নাম করিতে হয়, তবে গঙ্গভক্তিতরঙ্গিণী-কার দুর্গাপ্রসাদের নাম তাঁহাদের মধ্যে দিতেই হইবে। গ্রন্থখানি নিরেট, অচ্ছিদ্র, ভাবে ভোরপুর, রসে ডগমগ; ইহার ভাষা সরস, সরল, প্রাঞ্জল, ভক্তিরসে পূর্ণ, ভক্তিতরঙ্গিণীতে তরঙ্গিণী। এমন গ্রন্থ আজি কালি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। মধ্যে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবু একবার ছাপাইয়াছিলেন; সে সংস্করণও বোধ হয় ফুরাইয়াছে। আবার মুদ্রিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

আমরা বালককালে, ৮।১০ বৎসর বয়সে উলায় ছিলাম। তখন হইতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় গ্রন্থ লিখিতেছেন, আর তাহার পর পাঁচ যুগ—ষাটি বৎসর গিয়াছে, এখনও তাঁহার লেখনীর বিরাম নাই। তাঁহার প্রথম পুস্তক "বাখরগঞ্জের বিবরণ" পিতৃদেবকে পড়িয়া শুনাইতেন, আমার বেশ মনে আছে। বাখরগঞ্জের লোকেরা, 'ধনভাই বলে না, বলে, দনবাই'—এই সকল কথা তখন একমনে শুনিয়াছিলাম। তাহার পর কত বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র হইতে সংকলন করিয়া চন্দ্রশেখর বাবু সাহিত্য-ভাণ্ডারে উপঢৌকন দিলেন, সে সকলই আমাদের শিক্ষা সুকর করিবার আয়োজন। তাঁহাকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি, উলাও ধন্য হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ।

অনেক দিন আগেকার কথা বলিতেছি। তখন সিপাহী-বিদ্রোহ সবে শেষ হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র সে সময় নাগোয়ার মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন আর নাগোয়ায় মহকুমা নাই—কাঁথিতে উঠিয়া আসিয়াছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন নাগোয়ার হাকিম, তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তখন তমলুকের হাকিম। উভয় স্থানের মধ্যে বিশ ক্রোশ ব্যবধান। পাল্কীতে বা পদব্রজে এ পথ এক দিবসেই সচরাচর লোকে অতিক্রম করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে একদা অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণে তমলুক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তমলুকে আসিতে হইলে একটা নদী পার হইতে হয়। নদীর নাম হল্‌দি। ইহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। ইহাকে ক্ষুদ্র নদী বলিতে সাহস হয় না,—বিশেষ আজিকার এই প্লাবনের দিনে। তবে ইহা নির্ভয়ে বলিতে পারি, কলিকাতার সম্মুখস্থ গঙ্গার চেয়ে হল্‌দি অনেক ছোট। যে ঘাটে খেয়া নৌকায় হল্‌দি পার হইতে হয়, সে ঘাটের নাম নরঘাট, অথবা নরের ঘাট। গ্রামের নামও তাই। কেন এমন নাম হইল, তাহার কোনও ইতিহাস দেখিতে পাই না।

যাহা হউক, বঙ্কিমচন্দ্র যখন নরঘাটে আসিয়া পঁহুছিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্ন। তীরে খেয়া নৌকাখানি বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ত রাগিয়া অস্থির। মাঝির অনুসন্ধানে চাপরাশী ছুটিল। ঘাটের উপরে একখানি কুঁড়ে ঘর ছিল, তাহাতেই মাঝি ঝড় বৃষ্টি বা রৌদ্রের সময় আশ্রয় লইত। সে ঘরে মাঝি নাই। তখন মাঝির বাড়ী কোথায়, তাহার অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। পাল্কী দেখিয়া গ্রামের দুই চারি জন নিষ্কর্ম্মা লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন মাঝির বাড়ী দেখাইয়া দিতে অনেক পীড়াপীড়ির পর স্বীকৃত হইল। চাপরাশী মহাবেগে তাহার সহিত ধাবিত হইল। কিন্তু তাহাকে বেশী দূর যাইতে হইল না; মধ্য পথেই মাঝির সহিত সাক্ষাৎ। মাঝির পরিচয় পাইয়াই চাপরাশী তাহাকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং যাহাতে শিক্ষাটা সহজে অঙ্গ হইতে মুছিয়া না যায়, তাহারও

ব্যবস্থা করিল। মাঝি কাঁপিতে কাঁপিতে হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত। হাকিম দুই চারি ধমক দেওয়াতে মাঝি কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর! আমার ছোট মেয়েটির ওলাউঠা হয়েছে; বদ্যিতে জবাব দিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত। তাঁহার ক্রোধ মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল। তিনি মাঝিকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার কুটীরের দিকে ধাবিত হইলেন, এবং তাহার কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইয়া গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিদিগকে ডাকাইলেন। গ্রামে যে দুই এক জন চিকিৎসক ছিল, তাহারাও আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাঝির হাতে দুই একটা টাকা দিলেন। চিকিৎসক প্রভৃতিকে তিনি বলিয়া গেলেন, "আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইব, তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্রের সহসা এতটা দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল কেন, ঠিক বলিতে পারি না। ইংরাজিতে যাহাকে revulsion of feelings বলে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেটা প্রায়ই হইত। তবে ক্রোধের মাত্রা যদি ধৈবত নিখাদে উঠিত, সেটা সহসা নামিয়া সহজ স্বর বা রেখাবে মুহূর্ত্তকালমধ্যে নামিত না। এ ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ অনুতাপ হইয়া থাকিবে। অনুতাপের বিশেষ কোনও কারণ দেখা যায় না। তবে এক এক জন এমন কোমলহৃদয় আছেন যে, তাঁহারা অপরাধ না করিয়াও আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাহিরে একটা গর্ব্ব, একটা ক্রোধের আবরণ ছিল; কিন্তু ভিতরটা বড় প্রেমময়। যে তাঁহাকে ভাল করিয়া না বুঝিয়াছে, সে তাঁহাকে ক্রোধী, গর্ব্বিত মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে পঁহুছিলেন, তখন অপরাহ্ন। জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট আরও দুই চারি জন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট অপরিচিত। তন্মধ্যে এক জনকে দেখাইয়া পূজ্যপাদ শ্যামাচরণ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্কিম, বলিতে পার, এই ভদ্রলোকটি কে?"

বঙ্কিমচন্দ্র ভদ্রলোকটির পানে একবার একটু তীক্ষ্ণনয়নে চাহিলেন, ক্ষণকাল কি ভাবিলেন; তার পর উত্তর করিলেন, "বাবু জগদীশনাথ রায়।"

সত্যই ইনি বাবু জগদীশনাথ রায়। ইনি তখন তমলুকে সহকারী পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-রূপে অবস্থান করিতেছিলেন। জগদীশ বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরে

একটু চমৎকৃত হইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রসারিত হস্ত গ্রহণ করিলেন; এবং আজীবন তাহা হস্তমধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

সাহিত্য ও সমাজ।

ফরাসী সাহিত্যসেবী মসিয়ে ফাক্ৰী (M. Faguet) বালজাকের সমালোচনা শেষ করিয়া সাহিত্যের সহিত সমাজের কি সম্বন্ধ, ইহারই আলোচনা করিয়া একটী সুদীর্ঘ সন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। সন্দর্ভটি এতই সুন্দর হইয়াছে যে, উহা একই সময়ে ফ্রান্সে, জর্ম্মনীতে, ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভগত সিদ্ধান্ত সকল লইয়া বেশ একটু আলোচনাও হইতেছে; এমন কি, লণ্ডনে যে সভ্যজগতের চিকিৎসকগণের মহাসভা বসিয়াছিল, সেখানেও এ কথা উঠিয়াছিল। এই সন্দর্ভের সারাংশ ভাষান্তরিত করিয়া বাঙ্গালী পাঠকগণকে উপঢৌকন দিতেছি।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইঙ্গরসোলের (Ingersoll) সহিত রেভারেণ্ড ওয়ার্ড বীচরের (Rev. Ward Beecher) বাইবেলের ধর্ম্ম-মত লইয়া বিষম বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। ইঙ্গরসোল নাস্তিক (Agnostic) মতবাদ সমর্থন করিয়া বাইবেলের—খৃষ্টান ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিয়াছিলেন। পাদ্রী বীচার খৃষ্টানদিগের পক্ষ সমর্থন করেন। বিতণ্ডাটা আমেরিকার যুক্তরাজ্যে হয়, এবং সেই সময়ে এই বিচার লইয়া সভ্য-জগতে খুব একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাদ-বিবাদের মধ্যে পাদ্রী বীচর একটা বড় সিদ্ধান্তের কথা বলেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক ভাষার ও সাহিত্যের একটা ধর্ম্ম আছে। খ্রীষ্টান ইউরোপের সকল সভ্য দেশের ভাষার ধর্ম্ম খ্রীষ্টানী তবে প্রত্যেক দেশের ও জাতির বিশিষ্টতার সহিত সে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম অনেকটা পরিবর্দ্ধিত ও আকারান্তরিত হইয়াছে। ইংরেজি ভাষার ও সাহিত্যের প্রত্যেক স্তরে খ্রীষ্টান ধর্ম্মমত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ আধুনিক ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতের দ্বারা যেন স্নিগ্ধ হইয়া আছে। তুমি ইঙ্গরসোল, যে ইংরেজি ভাষার সাহায্যে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের খণ্ডন করিতেছ, সেই ইংরেজি ভাষায় খ্রীষ্টানী মত ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে বিরাজ করিতেছে। অতএব তোমার বিতণ্ডা ব্যর্থ হইতেছে।

যে সময়ে পাদ্রী বীচর এই কথা বলেন, সেই সময়ে সভ্য ইউরোপ খণ্ডে ডারবিন-তত্ত্ব (Darwinism) লইয়া বিষম আন্দোলন চলিতেছিল। তখন ইউরোপ প্রতিবেশ-প্রভাব (Theory of Environments) এবং অবস্থার আনুগত্য (Natural selection) এই দুইটা সিদ্ধান্ত ধরিয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল। ফলে, পাদ্রী বীচরের কথা কেহই বাজে বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। পক্ষান্তরে, জর্ম্মনীর বহু পণ্ডিতে বিজ্ঞানের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তের পোষণ ও সমর্থন করিয়াছিলেন। সে সময় হইতে এখন পর্য্যন্ত

ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া আছে যে, যে জাতির যে ধর্ম্ম, সেই জাতির ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতা সেই ধর্ম্মের অনুকূল হইবেই। এমন কি, ভাষার প্রত্যেক শব্দ, রচনা-ভঙ্গী, অলঙ্কার-সমাবেশ ও রসের বিকাশ, সেই ধর্ম্মের ধ্বনি করিয়া থাকে। ইংরেজি ভাষার প্রত্যেক শব্দটিতে খৃষ্টানী মাখান আছে। ইংরেজি সাহিত্যের প্রত্যেক গ্রন্থে খৃষ্টান মত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। সাহিত্যকে ধর্ম্ম হইতে চ্যুত করা যায় না। যে কালের যে সাহিত্য, সেই কালের সমাজ-ধর্ম্ম ও সাধন-ধর্ম্ম সেই সাহিত্যে জড়ান মাখান থাকিবেই। সাহিত্য জাতিবিশেষের এক একটা যুগের ইতিহাস, ধর্ম্মমতের আলেখ্য-স্বরূপ। যিনি যে জাতির যে যুগের সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিবেন, তাঁহাকে সেই জাতির সেই যুগের ধর্ম্ম-মতের দ্বারা আচ্ছন্ন হইতেই হইবে।

মসিয়ে ফাজী এই ভাবে সাহিত্যগত ধর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—ফরাসী বিপ্লবের সময় হইতে এমীল জোলার যুগ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ কালের ফরাসী জাতির সাহিত্যের কোন ধর্ম্ম? ফরাসী-বিপ্লবের পূর্ব্বে রোম্যান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব ফরাসী সমাজে ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। তাই ফরাসী-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে ফরাসী সাহিত্য বিলাসের সাহিত্য ছিল। সে সাহিত্য সমাজ-মত-দ্যোতক ছিল না; সে সাহিত্যের প্রভাব ফরাসী সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তাহার পর বিপ্লবের সূচক যে সাহিত্যসৃষ্টি ফরাসী দেশে হইয়াছিল, তাহা খৃষ্টান সাহিত্য নহে। ভলটেয়ার, রুসো, ডিডেরো প্রভৃতি মনীষী লেখকগণকে কোনও ক্রমে খৃষ্টান বলা যায় না। বরং তাঁহাদের লেখার প্রভাবে খৃষ্টান ধর্ম্মের খণ্ডন হইয়াছিল; খৃষ্টান সমাজের উচ্ছেদ সাধন করা হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু বলিতে হয় যে, যে ফরাসী সাহিত্য প্রায় পাঁচ শত বৎসরের খৃষ্টান সভ্যতার ফল, সহস্র বৎসরকালের খৃষ্টান ধর্ম্মমত-সাধনের পরিণতির স্বরূপ, সে ফরাসী ভাষার মজ্জাগত খৃষ্টান-ভাব ভলটেয়ার রুসোর লেখাতেও একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। এক-দিনে ভাষার সৃষ্টি হয় না; যুগযুগান্তরের চেষ্টায় একটা ভাষা পূর্ণাঙ্গ হইয়া ফুটিয়া বাহির হয়; যুগযুগান্তরের মতবাদ, ভাব, ধ্যান, ধারণা ভাষার স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে; সে সকল স্তর-বিন্যস্ত ভাবরাশিকে একটা বিপ্লবের ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ফরাসী-বিপ্লব ধ্বংসের বিপ্লব হইলেও, ভলটেয়ার রুসোর মতন অমানুষপ্রতিভাশালী ধ্বংসাবতার অবতীর্ণ হইলেও, ফরাসী সাহিত্যকে উহার ধর্ম্মের বেদী হইতে তাঁহারা কেহই নামাইতে পারেন নাই। তাই নেপোলিয়ন সম্রাট পদবী পাইলে আবার রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই নেপোলিয়নের অধঃ-পতনের পর ফরাসী রাষ্ট্রপতিগণ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিপ্লবের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে বালজাক, ভিক্টর হিউগো, এমীল জোলার উদ্ভব হইয়া-ছিল। একটা বড় দাঁড়া আর্শীর উপরে কোন দুষ্ট ছেলে একটা ঢেলা ছুড়িয়া মারিলে মুকুরটি ফাটিয়া শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়, অথচ ফ্রেমের বন্ধনীর প্রভাবে কাচখণ্ডগুলি করিয়া পড়ে না—সেই ভগ্ন মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইলে কিম্ভূতকিমাকার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী বিপ্লবে ভগ্ন ফরাসী সমাজের সনাতন মুকুরখানি চৌচির হইয়া

গিয়াছিল। সেই ভগ্ন জাতীয় মুকুরে ফরাসী সমাজের যে প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বালজাক্ তাহারই আলেখ্য অপূর্ব্ব ভাবায় লিখিয়া গিয়াছেন। সে আলেখ্যে ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে—উৎকট উদ্ভট সবই আছে। কিন্তু সে সকলই জাতির অতীত গৌরবের অতীত ইতিহাসের ফ্রেমে আঁটা—ফরাসী ভাষার ও সাহিত্যের বন্ধনী-সংলগ্ন। বালজাক্ পরম্পরার কথা বিস্মৃত হন নাই। বালজাক্ অতীতকে বর্ত্তমানের সম্পর্ক-শূন্য করিয়া দেখান নাই। বালজাক্ই বলিয়াছেন,—To look back is to look beyond পশ্চাতে দেখিলেই সম্মুখে দেখিতে হইবে—যে অতীতের চিন্তা করে, তাহাকে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতেই হইবে। বালজাক্ অতীতের আলেখ্য লিখিয়াছেন, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করিতে ভুলেন নাই। অতএব বালজাক্ ধর্ম্মহীন নহেন। তিনি যে ফরাসী!

বালজাক্ বলিয়াছেন,—যেমন সূত্রের সাহায্যে মালা গাঁথা যায়, তেমনই ভাষার সাহায্যে যুগ-যুগের সাহিত্যকে গাঁথিয়া রাখা যায়। ভাষা সূত্র, সাহিত্য ফুল, এ সূত্র ছিন্ন হয় না, এ ফুল শুকায় না। তিনিই বলিয়াছিলেন যে, ফরাসী-বিপ্লব ফরাসী জাতির পারম্পর্য্যের ছেদ নহে—গতির বিরাম নহে; মালায় জোট্ ধরিয়াছিল, সেই জোট খুলিবার চেষ্টা মাত্র। তিনিই বলিয়া গিয়াছেন,—'বিস্মৃতি! আরে ছিঃ ছিঃ! বিস্মৃতি ত জারজের আশ্রয়। আমি বাপের বেটা, জাতিতে ফরাসী, আমি বিস্মৃতির আশ্রয় লইব কেন? যখন ফরাসী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ভুলিতে ত আসি নাই, ভুলিবও না, বরং অহরহঃ জাহাজী গোরাদের মতন অতীতকে তামাকের গুঁড়ির হিসাবে কেবল চিবাইব; বালক যেমন চকোলেট চাটে, তেমনই করিয়া অতীত স্মৃতিকে চাটিব—ধীরে ধীরে, রসাইয়া মজাইয়া লেহন করিব। কেবলই কি দর্পদম্ভের, শ্লাঘাস্পর্দ্ধার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হয়? লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষোভ, সঙ্কোচের বিষয় লইয়া নাড়া-চাড়া করিলে ক্ষতি কি? ঢাকিলেই পাপ, লুকাইলেই শয়তান দেখা দেয়; যেখানে প্রচ্ছন্নতা, সেইখানেই শয়তানের রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি ভুলিব কেন?' যে কবি এমন কথা কহিতে পারেন, তিনি ত সমাজ-ধর্ম্ম-হীন নহেন। তিনি ভাষার ধর্ম্ম নষ্ট করেন নাই, তিনি জাতির ধাতু ভুলেন নাই।

এমীল জোলা বালজাকের এই উপদেশটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। জোলাও সমাজকে আবরণহীন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। উলঙ্গতার লাম্পট্যে বিভোর হইয়া তিনি এমন কর্ম্ম করেন নাই। সমাজকে প্রাণের প্রাণ বলিয়া জানিয়া, সভ্যতার আবরণে সে সমাজের সর্ব্বাঙ্গে কেমন ভাবে শয়তান অধিকার বিস্তার করিয়াছে, তাহাই সকলকে বুঝাইবার জন্য জোলা ভদ্রতার ও শিষ্টাচারের অবগুণ্ঠন মোচন করিয়াছিলেন। জোলা ভাষার ধর্ম্মের এবং সাহিত্যের ধর্ম্মের প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। ইউরোপ দেখিয়াছে যে, বাস্তবতার বিকটতার মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। সে ধর্ম্ম crystalised French manhood পাষাণীকৃত ফরাসী মানবতা। সে পাষাণীকরণে অতীতের ইতিহাস স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রহিয়াছে; সহস্র বৎসরের ফরাসী সভ্যতা "দারুভূতো মুরারির" ন্যায় হইয়া

আছে। তাই জোলা বলিয়াছেন,—মানুষের লেখা আর বিধাতার লিপি একই, দুইটার কোনটাই মুছিয়া ফেলা যায় না। বংশের পর বংশ আসিয়াছে, বংশে-বংশে যুগে যুগে কত লেখাই লিখিয়া গিয়াছে, বংশানুক্রমের প্রভাবে সে লেখা অস্থিতে অস্থিতে মজ্জায় মজ্জায় যেন গাঁথিয়া জাঁতিয়া বসিয়া আছে। সে প্রকৃতির লেখা মুছা যায় না। জোলা তাই প্রকৃতির—সংস্কারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার লজ্জা নাই, ক্ষোভ নাই, কেন না, তিনি যেন শয়তানকে আলোর মাঝারে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছেন। কাজেই বলিতে হয় যে, এমীল জোলা ধর্ম্মের অপহ্নব ঘটান নাই, ভাষা ও সাহিত্যের ধর্ম্মপারম্পর্য্য বিস্মৃত হন নাই।

ভিকটর হিউগোর পক্ষে এতটা কৈফিয়ৎ প্রয়োজন হইবে না। ভিকটর হিউগো ইউরোপের পুরাণকার। তিনি নভেল বা উপন্যাস *লেখেন নাই, অর্থবাদের হিসাবে* সমাজের উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাস গ্রন্থ সকল কেবল চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত নহে, প্রধানতঃ ভাবোন্মেষের জন্য লিখিত। সে ভাবোন্মেষে অতীতের সহিত পরম্পরা-রাহিত্য ঘটায় না, সে ভাবোন্মেষ পাঠককে আত্মহারা করিয়া দেয় না,—অতীতকে মুছিয়া ফেলিয়া বর্ত্তমানে প্রমত্ত করিয়া রাখে না। হিউগো সমাজের সকল স্তরের বর্ণনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, হিউগো ইতরতা ও হীনতা, পশুত্ব ও পিশাচত্ব অঙ্কিত করিতে লজ্জিত হন নাই; হিউগো দারিদ্র্যের বিকটতা দেখাইয়াছেন, ঐশ্বর্য্যের পৈশাচ ভাবও দেখাইয়াছেন। কিন্তু পুরাণকারের মতন, অর্থবাদের হিসাবে ইতিহাসের সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এমন লেখকের হস্তে ধর্ম্ম ও মানবতা শতদল পদ্মের মতন ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিউগো সমাজের ভাল মুকুরে ছবি দেখান নাই, দর্শকের দর্শন-সৌকর্য্যার্থ হিউগোকে কখনই করস্থিত মুকুরের আকার-পরিবর্ত্তন করিতে হয় নাই। হিউগো বলিতেছেন—'দেখ সোজা--খাড়া হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে দেখ! এ দিকেও দেখ, ঐ দিকেও দেখ। সব দেখিয়া নিজের দিকে দেখ। যদি আমার আলেখ্য-পরম্পরায় তোমার মতন কাহাকেও চিনিতে পারিয়া থাক, তাহা হইলে আমার কথা শুন। নহিলে তোমার লাভ চিত্তবিনোদন, আমার লাভ ফিরিওয়ালার ছবি দেখানর সুখ।' ইহা ধর্ম্মযাজকের কথা—পুরাণকার ঋষির কথা। ইউরোপের সাহিত্যে ইতঃপূর্ব্বে এমন কথা আর কেহ বলে নাই।

মসিয়ে ফাজি (M. Faguet) এই ভাবে তিন জন যুগপ্রবর্ত্তক ফরাসী লেখকের বিশ্লেষণ করিয়া শেষে তিনটি সিদ্ধান্তের কথা কহিয়াছেন:—

(১) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির মেদমজ্জার সহিত জড়িত;—তাহা জাতির সকল স্তরে সঞ্চারিত,—উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্য্যন্ত সকল লোকেই পরিব্যাপ্ত।

(২) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির অতীত পারম্পর্য্যের সহিত সংবদ্ধ—মালাগ্রথিত পুষ্প শ্রেণীতুল্য।

(৩) যাহা জাতির সাহিত্য, তাহা জাতির সমাজধর্ম্মবর্জ্জিত হইতে পারে না; তাহা জাতির ভাষানিহিত ধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না।

তিনি ইহাও বলেন যে, ধর্ম্মবিপ্লব না ঘটিলে ভাষার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয় না। এমন কি, ধর্ম্মবিপ্লব সত্ত্বেও এক একটি শব্দে, ভাষার এক একটি বচন ভঙ্গীতে অতীত যুগের বিস্মৃত অনেক ইতিহাস-কথা প্রচ্ছন্ন থাকে। খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রায় দেড় হাজার বৎসর ইউরোপে প্রবল থাকিলেও, এখনও ইউরোপের সকল সভ্যপ্রদেশের ভাষায় গ্রীস ও রোমের কঙ্কাল খুঁজিলেই পাওয়া যায়। পারম্পর্য্যের চিহ্ন একেবারে মুছিয়া ফেলিবার নহে। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ভাষা কেবল সাহিত্যের উপাদান নহে, উহার সর্ব্বাঙ্গ জাতির পদচিহ্নে অঙ্কিত। ভাষা সমাজের অভিব্যঞ্জনা; এই অভিব্যক্তি বিহঙ্গ-কলরবের ন্যায় ব্যোমপথে মিশাইয়া যায় না, সাহিত্যের মর্ম্মর-গাত্রে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত থাকে। ভাষা সাহিত্যের সৃষ্টি করে, আবার সাহিত্যের আশ্রয়ে ভাষা আত্মরক্ষা করে। মানুষের ভাষা আছে, সে ভাষায় সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সে সাহিত্য সনাতন হইয়া থাকে। তাই মানুষ—মানুষ, নিস্তাঁজ পশু নহে। পশুর স্মৃতি নাই, স্মৃতির অক্ষয় মঞ্জুষা নাই; তাই পশুর উন্নতি নাই, স্থিতি নাই, বিকাশ নাই। মানুষের স্মৃতি আছে স্মৃতি-রক্ষার অক্ষয় মাঞ্জুষা সাহিত্য আছে; তাই মানুষ নরদেবতা হইয়াছে, পরে আবার হইতেও পারিবে। সাহিত্যের সৃষ্টি ধর্ম্মের উপাদানে হইয়া থাকে। সে ধর্ম্ম প্রথম স্তরে, বিভীষিকার উপাসনা, সৌন্দর্য্যের আরাধনামাত্র। ইহার পর স্তরে স্তরে মানুষ যেমন উন্নীত হয়, তদনুসারে মানুষের সাহিত্যও আকারান্তরিত হয়। এই অসংখ্যস্তরবিন্যস্ত সাহিত্য বিশ্বমানবতার ইতিহাস—দেবত্বের উন্মেষকাহিনী। এই সাহিত্যে যিনি একটা নূতন স্তর বসাইয়া গিয়াছেন, জাতির বিশিষ্টতার চীনা-প্রাচীরে যিনি দুই চারিখানা ইষ্টক গাঁথিয়া গিয়াছেন, তিনি সাহিত্য-গত-ধর্ম্মহীন হইতে পারেন না।

নষ্ট-রত্ন।

রাণী সুব্রতা স্থির করিয়াছিলেন, কোনও পবিত্র বংশের সর্ব্বসুলক্ষণা কন্যার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিবেন। অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও দরিদ্রের গৃহে তাঁহার মনের মত এক পাত্রী জুটিল। পাত্রীর নাম গৌরী। গৌরী সদ্বংশজাতা,—রূপে গুণে ঠিক গৌরীরই মত। শুভদিনে রাজপুত্রের সহিত গৌরীর মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরদিবস বধূ ঘরে আসিল। রাণী সুব্রতা একছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা দিয়া পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বিবাহ-রাত্রির পররাত্রি—'কালরাত্রি'। প্রচলিত প্রথা অনুসারে সে রাত্রে রাজপুত্র স্বতন্ত্র কক্ষে শয়ন করিলেন। রাণী সুব্রতা পুত্রবধূর হাত ধরিয়া আপন শয়ন-কক্ষে আসিলেন। পার্শ্বে বধূকে সযত্নে শয়ন করাইয়া রাণী কহিতে লাগিলেন,—"মা, তুমি আজ যে মুক্তার মালা

কণ্ঠে ধারণ করিয়াছ, তাহার ইতিহাস তোমাকে এখন বলিব। একটু মনোযোগপূর্ব্বক শুনিও, এবং মনে রাখিও, বংশ পরম্পরায় সকলকে প্রত্যেকের পুত্রবধূকে এই ইতিহাস শুনাইয়া যাইতে হইবে।

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার শ্বশ্রূমাতা এই মালা দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—শুনিয়াছি। আমাদের বংশের প্রথম রাজার সময় হইতে এই মালা ছড়াটি নববধূর আশীর্ব্বাদীস্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে এই মালার মাঝখানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল মুক্তাটির স্থান একেবারে শূন্য ছিল। কেন শূন্য ছিল, তাহা তখন জানিতাম না। আমার বিবাহের পরদিবস স্বতন্ত্র কক্ষে আমার শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার পিত্রালয় হইতে যে দাসী আসিয়াছিল, একমাত্র সেই আমার নিকট রহিল। শয়নের পূর্ব্বে শ্বশ্রূমাতা কহিলেন, "বউ মা! যদি ভয় পাও, তা হ'লে আমার নিকট উঠিয়া আসিও।" তখন এ কথার অর্থ কিছুই বুঝি নাই; পরে বুঝিলাম, কেন তিনি আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন। আমি শৈশবাবধি বড় দুঃসাহসী ছিলাম, সুতরাং ভয়ের কথা মনে স্থান পাইল না। বিশেষতঃ, সেদিন পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন, সকলকে ত্যাগ করিয়া আসিয়া মনটা এতই কাতর ছিল যে, অন্য কোনও চিন্তা করিবার অবসর ছিল না। দাসীর অবিশ্রান্ত নাসিকাধ্বনি শুনিতে শুনিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জানি না। ঘুমন্ত অবস্থায় মনে হইল, কে যেন আমার গলার মালা ধরিয়া টানাটানি করিতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, এক স্ত্রীমূর্ত্তি। মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট, শীর্ণ ও মলিন, নিবিষ্টদৃষ্টিতে আমার মুক্তার মালায় কি যেন অন্বেষণ করিতেছে। প্রথমে মনে করিলাম, কোনও পুরমহিলা সময় মত আসিতে পারে নাই—তাই আমাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আসিয়াছে; সেই ছায়ামূর্ত্তি অগ্রসর হইয়া আমার শরীরে হস্তস্থাপন করিল, কিন্তু আমি কোনও স্পর্শ অনুভব করিলাম না! তখন বুঝিলাম, সে ছায়ামূর্ত্তি তখন শ্বশ্রূ মাতার কথা মনে পড়িল। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য কেমন একটা কৌতূহল জন্মিল। কিছুমাত্র ভীত না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি চান?"

আমার কথা শুনিয়া সেই শীর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, "এই মালায় যে মুক্তাটি হারাইয়াছিল, সেটি পাওয়া গিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে আসিয়াছি।" আমি বিস্মিত হইয়া

কহিলাম, "এ মালা সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? আপনি কে?" রমণী-মূর্ত্তি তখন বিষণ্ণভাবে একটু হাসিয়া সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। কহিল, "এ মালা সম্বন্ধে যাহা জানি, তাহাই বলিবার জন্য কত বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছি; আজ পর্য্যন্ত যাহাকে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই ভয়ে পলাইয়াছে; তোমার মত কেহ কথা কহিতে সাহস পায় নাই। আজ তোমার কাছে এই মালার কাহিনী বলিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তাহা না হইলে আমার মুক্তি নাই। আমি রাণী নর্ম্মা, এই বংশের প্রথম রাজার স্ত্রী। আমিই এই মালা সর্ব্বপ্রথম পাই—সে আজ শতাধিক বৎসরের কথা। এই মালার মাঝখানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে মুক্তাটি ছিল, সেটি আমিই হারাইয়াছিলাম। কি কারণে কেমন করিয়া হারাইলাম, অদ্যাপি কেহ জানে না। তাই এ বংশে নববধূ এ মালা অঙ্গে ধারণ করিলেই আমাকে সে কাহিনী শুনাইতে আসিতে হয়। তোমাকে আজ সেই কাহিনী শুনাইতে চাই। ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিবে ত?"

আমি তখন উঠিয়া বসিলাম। রাণী নর্ম্মার জন্য করুণায় মন ভরিয়া গেল। কহিলাম, "মা! তুমি আমার পূজ্যা, প্রণাম গ্রহণ কর; আমি শপথ করিতেছি, তোমার কাহিনী অদ্যোপান্ত শুনিব, এবং বংশপরম্পরায় যাহাতে এ কাহিনী শুনিতে পায়, তাহার ব্যবস্থাও করিব। তোমার আর আসিবার প্রয়োজন হইবে না, তুমি মুক্তি লাভ কর।" তখন সেই বিষণ্ণ ছায়ামূর্ত্তি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; কহিল, "কল্যাণী! তুমিই এই মালার শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে পারিবে, এই আমার আশীর্ব্বাদ রহিল। এখন আমার জীবনের কাহিনী শোন। বংশপরম্পরাক্রমে যে নববধূ এই মুক্তার মালা কণ্ঠে ধারণ করিবে, শুধু তাহারই এ কাহিনী শুনিবার অধিকার, যেন কর্ণান্তরে না যায়।"

রাণী নর্ম্মা কহিতে লাগিলেন,—আমাদের দেশস্থ রাজেন্দ্রনারায়ণ বহু কষ্টে অর্থসঞ্চয় করিয়া যখন প্রথম জমীদারী ক্রয় করেন, তখন আমার পিতাকে বাল্যবন্ধু বলিয়া এবং সচ্চরিত্র ও সত্যনিষ্ঠ জানিয়া তাঁহাকে তিনি প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। আমি তখন তিন বৎসরের শিশু। পরে মাতার নিকট শুনিয়াছি, জমীদার মহাশয় আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি বিপত্নীক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে আমি শৈশবাবধি খেলা করিয়া বেড়াইতাম। আর আমাদের খেলার সঙ্গী

ছিল নায়েব-পুত্র রমানাথ। আমার দশ বৎসর বয়সে সহসা জমীদার মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে সপ্তদশবর্ষীয় জমীদার-পুত্রের ভার আমার পিতা মাতার উপর ন্যস্ত হয়। আমাদিগকে তখন আপন গৃহত্যাগ করিয়া, জমীদার-বাটীতে বাস করিতে যাইতে হইল। সেই সূত্রে, একত্র বসবাসে জমীদার-পুত্রের সহিত আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। পিতা মাতা জমীদার-পুত্রকে যেরূপ সম্মান করিতেন, তেমনই স্নেহও করিতেন; আমার শিশু-হৃদয়ে তিনি চিরদিনই রূপে গুণে আদর্শ-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়েও যে ক্রমে আমার প্রতি গভীর ভালবাসার সঞ্চার হইতেছিল, আমরা কেহই তাহা ভাবি নাই। আমার দ্বাদশ বৎসর বয়সে, তাঁহার খেলার সঙ্গিনীকে তিনি যখন জীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইতে চাহিলেন, তখন পিতা মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি এত সৌভাগ্যের অধিকারিণী হইব, তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। নায়েব-পুত্র রমানাথের সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাব হইতেছিল। সমকক্ষ সমপদস্থ কোনও রাজকন্যার সহিত জমীদার-পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। বাস্তবিক আমার মত ভাগ্যবতী জগতে দুর্লভ। কিন্তু জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফলে যাহা ঘটিল, বলিতেছি, শোন।

আমার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, আমার স্বামী যে দিন রাজা উপাধি পাইলেন, সেই দিন ঐ মুক্তার মালাটি লইয়া আসিয়া স্বহস্তে আমার গলায় পরাইয়া দিয়া কহিলেন, "নর্ম্মা! তোমাকে জীবনের সঙ্গিনী পাইয়া যে সম্মান লাভ করিয়াছি, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই নয়—তবু আজ লোকসমাজে তুচ্ছ সম্মান লাভ করিয়া তাহারই নিদর্শন-স্বরূপ এই মুক্তার মালা তোমার জন্য আনিয়াছি। মাঝখানে যে উজ্জ্বল ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুক্তাটি দেখিতেছ, ইহা অতি দুর্লভ, তোমারই মত শুভ্র ও পবিত্র। জহুরী বলিয়াছে, 'বস্তুটি পবিত্রতার নিদর্শন, উহাকে অপবিত্রতা স্পর্শ করিতে পারে না।' এই বলিয়া আমাকে বক্ষে লইয়া বারংবার মুখচুম্বন করিলেন। আনন্দে আমার মন প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিলাম, তোমার মত স্বামী যাহার, তাহাকে কি অপবিত্রতা কখনও স্পর্শ করিতে পারে?

কিন্তু কোথা হইতে মোহ কিরূপে ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া মনের মধ্যে

প্রবেশ করে, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। স্বামীর প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি ও ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও কেমন করিয়া যে মন অপবিত্রতা আহরণ করিল, আজিও তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

আমাদিগের আশৈশবের খেলার সঙ্গী নায়েব-পুত্র রমানাথ, স্বামীর সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু; চিরকাল একত্র প্রতিপালিত হওয়ায় আমাদের গৃহে তাহার অবারিত গতিবিধি ছিল। স্বামী আমাকে রমণীর শ্রেষ্ঠতম আদর্শ বলিয়া জানিতেন। আমারও আত্মাভিমান ও আত্মসম্মানজ্ঞান খুবই প্রবল ছিল। সুতরাং রমানাথের সহিত আলাপে পরিচয়ে কাহারও মনে কোনও দিন দ্বিধামাত্র হয় নাই।

রমানাথ যে আমার বিবাহকাল পর্য্যন্ত আমারই আশায় বসিয়াছিল, এবং আমার বিবাহের পর হিংসাপরবশচিত্তে, স্বামীর সহিত সখ্যের ছলনা করিয়া, আমাদেরই সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিল, তাহার আভাসমাত্র কখনও বুঝিতে পারি নাই।

তাহার স্নেহে—শুধু আমরা কেন,—আমাদের শিশুপুত্র শচীন্দ্রও একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। শচীন্দ্র যেমন শয়নে স্বপনে "কাকা" দেখিত, রমানাথও তেমনই মুহূর্ত্তকাল শচীন্দ্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। এই-রূপে সময়ে অসময়ে রমানাথ সতত অন্দর মহলে অবাধে যাতায়াত করিত। রমানাথ না হইলে কিছুই চলে না, সে না থাকিলে শচীন্দ্র ও তাহার জননীর কিছুই ভাল লাগে না। স্বামী তাহা লইয়া সময় সময় রঙ্গ রহস্য করিতেন, কিন্তু আমরা সকলেই জানিতাম, রমানাথ সর্ব্বতো[illegible] জিতেন্দ্রিয় পুরুষ, সুতরাং সে সকল রহস্য কাহারও মনে স্থান পাইত না। তখন পর্য্যন্ত রমানাথকে স্নেহ করিতাম। পুত্র শচীন্দ্রের খাতিরে তাহার সেবা করিয়া আনন্দ পাইতাম। ক্রমে বুঝিলাম, আমার মনের ভাব যেমনই হউক, রমানাথের মন ঠিক নির্ব্বিকার ছিল না। সে সুযোগমত অনেক কথা আমাকে বলিত। আমিও অবোধের ন্যায় সে সকল কথা শুনিতে আপত্তি করিতাম না।

একদিন দ্বিপ্রহরে—কার্য্যোপলক্ষে স্বামী বহির্বাটীতে ছিলেন, পালঙ্কোপরি শচীন্দ্র নিদ্রিত, আমি একখানি আসন বুনিতে ব্যস্ত। রমানাথ নিঃশব্দে আসিয়া নিকটে উপবেশন করিল। অসময়ে, অকারণে আসিবার কারণ প্রথমতঃ বুঝিলাম না, কিন্তু বুঝিতে অধিক বিলম্ব হইল না। আমি

অনুভব করিলাম, সে নির্ব্বিষ্টনয়নে আমাকেই দেখিতেছে। কিছু বলিলাম না। অজ্ঞাতসারে আমার কর্ণদ্বয়ে যেন অগ্নিসঞ্চার হইল, আমি বুঝিলাম, আমার মুখ ক্রমে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে। ইতিমধ্যে রমানাথ ডাকিল, "নর্ম্মা!"—কি স্পর্দ্ধা! ইতঃপূর্ব্বে সে কখনও আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে সাহস পায় নাই, তাহার মুখে নিজের নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, কিন্তু কি জানি কেন, বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া নীরবে শুনিলাম। সে কহিল, "নর্ম্মা! আমার সঙ্গে বিবাহ হইলে কি তুমি কম সুখী হইতে?" আমি অনন্যমনে কহিলাম, "কি জানি!" পরক্ষণে স্বামীর কথা স্মরণ হওয়ায় আমি লজ্জিত হইলাম, ভাবিলাম, "ছি ছি! করিলাম কি?" তথাপি সে কথার মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। মনের ভাব মনেই রহিল। রমানাথ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল,—"আমি সম্পদ ঐশ্বর্য্য তোমাকে দিতে পারিতাম্ না সত্য, কিন্তু এত ভালবাসিতে আর কে পারিবে?" তখনও তাহার জন্য করুণার উদ্রেক হইল। কেন? জানি না। শপথ করিয়া কহিতে পারি, স্বামী ব্যতীত অন্য কাহাকেও কোনও দিন ভালবাসি নাই, কিন্তু কেন তখন পুরুষ প্রকৃতির নীচ বাসনার ছল বুঝিলাম না?

তার পর একদিন স্বামী সহ নিমন্ত্রণে চলিলাম। শচীন্দ্রের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য রমানাথ রহিল। স্বামীর বারংবার অনুরোধে সেই বহুমূল্য মুক্তার হার পরিলাম—আমাকে সুসজ্জিত দেখিতে স্বামী চিরদিনই ভালবাসিতেন। এখন দেখিতেছ—শীর্ণ, বিবর্ণ, কঙ্কালসার; সে কালে আমার মত সুন্দরী বিরল ছিল; অন্ততঃ আমার স্বামী তাহাই বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। আমাকে পলকহীন নয়নে দেখিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। স্বামীর সে গর্ব্ব, সে আনন্দ স্মরণ করিয়া এখনও পুলকে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

তাঁহার ফিরিতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া তিনি আমাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, শচীন্দ্র অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে, পার্শ্বে বসিয়া রমানাথ।

রমানাথকে নীরবে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, আমি তাহাকে নিষেধ করিয়া বসিতে অনুরোধ করিলাম। ভাবিলাম, তাহাতে আর দোষ কি? তাহাতেই যে রমানাথকে কত বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হইল, মোহবশতঃ তখন তাহা বুঝিলাম না। আমাকে সে কি মনে করিয়াছিল, জানি না; এখন

সে কথা স্মরণ হইলে লজ্জায় ও ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। রমানাথ যখন কহিল, "নর্ম্মা! তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করিবার সাধ্য আমার নাই; কিন্তু যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণ কি যাতনা হয়, তুমি বুঝিতে পার কি?"

কেন সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে দূর করিয়া দিলাম না, কেন তাহার স্পর্দ্ধা তখনই দমন করিলাম না? এখন ভাবি—কেন? কেন এমন মোহে ডুবিলাম? কোথায় ছিল আমার আত্মসম্মান, কোথায় ছিল স্বামিগৌরবে গরবিণীর অভিমান? আমি কেমন একটু বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। আমাকে নীরব দেখিয়া রমানাথ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল, আমার হস্তধারণ করিয়া কহিল, "নর্ম্মা! তোমাকে চিরদিনেব মত হারাইয়াছি বলিয়া আমার জন্য একটু স্থানও কি তোমার হৃদয়ে নাই, একটি আশার কথাও কি কহিবে না?" আমি হতভাগিনী তখন মনে মনে ন্যায় অন্যায়ের বিচার করিতে-ছিলাম, দেখিতে দেখিতে —আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, তাহার এত দুঃসাহস সম্ভব—রমানাথ সহসা আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল; সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত শরীর মন বিদ্রোহ করিয়া, আমার যত গর্ব্ব, যত অভিমান ছিল, জাগরিত করিয়া তুলিল; আমি পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণীর ন্যায় ছট্‌ফট করিয়া তাহার বাহুপাশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম। রমানাথ আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "কেন আপ-নাকে ছলনা করিতেছ? তুমি যে আমাকেই ভালবাস, তাহাতে সন্দেহ নাই।" আমি বারংবার দৃঢ়স্বরে সে কথার প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও—বলিতে ঘৃণায় অন্তর দগ্ধ হয়—পাষণ্ড উপর্য্যুপরি আমার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। সেই সময় আমি প্রবল বেগে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলাম। যাইবার সময় সে হাসিয়া কহিল, "তুমি এখন যতই বিরক্তি প্রকাশ কর না কেন, ভাবিয়া দেখ, তুমি আমাকে প্রশ্রয় না দিলে আমার এত দুঃসাহস হইত কি? তোমাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলেও তোমাদের সুখের ঘর ভাঙ্গিয়াছি, ইহাও আমার সুখ।"

তখন আমার কোনও কথায় মনঃসংযোগ করিবার অবসর ছিল না। কারণ, রমানাথের গ্রাস হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টায় —কেমন করিয়া জানি না — আমার কণ্ঠস্থিত মালা ছিন্ন হইয়া মুক্তাগুলি একে একে ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তখন বিক্ষিপ্ত মুক্তাগুলি সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলাম। তখনও বুঝি নাই, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়া গেল। পরে যখনই

রমানাথের কথাগুলি স্মরণ হইয়াছে, তখনই দারুণ অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ভাবিয়াছি, কেন দুধ দিয়া কালসাপ গৃহে পুষিয়াছিলাম? কিন্তু দেখিলাম, অন্যের প্রতি দোষারোপ করা বিড়ম্বনামাত্র—আপনার পবিত্রতা আপনি রক্ষা করিতে জানিলে কে নষ্ট করিতে পারে? সে দিন যদি স্বামীর নিকট অকপটচিত্তে সকল কথা বলিতাম, তন্মুহূর্ত্তেই সকল মলিনতা কাটিয়া যাইত। কিন্তু বুঝি সেইখানে প্রাক্তনের অভিশাপ ছিল,—ভাবিলাম, যাহা ঘটিয়াছে, স্বামী কখনও তাহা জানিতে পারিবেন না, কৌশলে রমানাথকে উচ্ছেদ করিব, কেন বৃথা স্বামীর মনে সন্দেহের বীজ বপন করিব? সেই সূত্রেই যে মনে পাপ পোষণ করিয়া অপবিত্রতায় আত্মসমর্পণ করিলাম সে জ্ঞান তখন ছিল না। আমি তখন মোহ-সাগরে নিমগ্ন।

সে দিন রাগে অভিমানে বুঝিলাম, সত্যই আমার মনে স্বামী ব্যতীত আর কাহারও স্থান নাই। তথাপি—সত্য মিথ্যা দেবতা জানেন—যে উজ্জ্বল মুক্তাটি পবিত্রতার নিদর্শন বলিয়া স্বামী দিয়াছিলেন, সেটি খুঁজিয়া পাইলাম না। অন্যান্য মুক্তাগুলি সংগ্রহ করিয়া সেই রাত্রিতেই গাঁথিয়া রাখিলাম। আশা রহিল, পরদিন দিবসের আলোকে খুঁজিয়া পাইলে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিব। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, সে মুক্তাটির আর সন্ধান পাইলাম না। তখন ক্রমে মন বিষম ভারগ্রস্ত হইতে লাগিল। দ্বিগুণিত বলে স্বামীকে আশ্রয় করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সকল কথা তাঁহাকে বলিবার সাহস পাইলাম না। মনে যতই অনুতাপ হয়, স্বামীকে ততই জড়াইয়া ধরি, কিন্তু কিছুতেই আর আনন্দ—শান্তি পাই না। স্বামীর অগাধ ভালবাসাতেও তখন মন প্রাণ গর্ব্বে স্ফীত হয় না। দিনে দিনে শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। স্বামীর মনে কোনও রূপ সন্দেহের লেশমাত্র নাই। কারণ, তাঁহার চোখে আমার মত নিষ্পাপ রমণী জগতে আর ছিল না।

এইরূপে কিছু দিন কাটিল। আমি সতত ভীত সন্ত্রস্ত থাকিতাম, পাছে মুক্তার মালা স্বামীর নয়নগোচর হয়। কোনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে স্বামী মালা পরিতে বলিলে আমি নানা আপত্তি উত্থাপন করি। অবশেষে এক দিন স্বামী কোনও যুক্তিই আর মানিলেন না। শচীন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন হইয়াছে, বাড়ীতে বহুলোকের সমাগম হইবে, স্বামী জেদ ধরিলেন, সে দিন মালা পরিতেই হইবে। কিছুতেই স্বামীর

অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া মালা পরিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। স্বামী চলিয়া গেলেন; আমি কম্পিতহস্তে মালা খুলিয়া লইলাম, মালা পরিতে পরিতে শূন্য স্থান লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

সারাদিন উৎসবে কাটিল। সে সময়ে মালার কথা স্বামীর অথবা আমার কাহারও স্মরণ ছিল না। উৎসবান্তে অতিথিগণ বিদায় হইলে শয়নকক্ষে নিদ্রিত পুত্রের শিয়রে দাঁড়াইয়া আনন্দে অধীর হইয়া স্বামী আমাকে বক্ষে ধারণ করিলেন। তখনও মালার কথা আমার স্মরণ নাই। সেই শেষ স্বামীর আদরে গভীর আনন্দ উপভোগ করিলাম। সহসা মুক্তার মালা স্বামীর নয়নগোচর হইল। তিনি কহিলেন, "নর্ম্মা! এ মালা তোমাকে যেমন মানায়, তেমন আর কাহাকেও মানাইতে পারে না।" এই বলিয়া খেলাচ্ছলে আমার বক্ষে বিলম্বিত মালা হস্তে লইলেন, পরক্ষণেই মালা সহ আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন, আমার মুখ পানে অটল কঠিন দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া কহিলেন, "মাঝখানে শূন্য কেন? সে মুক্তা কোথায়?" আমি কি কহিলাম, কিছু স্মরণ নাই। আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল—কখন যে চেতনা হারাইলাম, কখন স্বামী চলিয়া গেলেন, কিছুই জানিতে পারিলাম না।

আমার যখন জ্ঞান হইল, তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, দাসীরা চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটী করিতেছে, বাড়ীময় কোলাহল পড়িয়াছে। সকল কথা স্মরণ হইল,—অশেষ যন্ত্রণা অনুভব করিলাম। কোথায় রহিল পুত্র কোথায় রহিল ঘর সংসার, শুধু স্বামীর সেই তীব্র দৃষ্টি থাকিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ ছুরিকার ন্যায় আমার মর্ম্ম বিদ্ধ করিতে লাগিল, এবং প্রতিমুহূর্ত্তে বজ্র গম্ভীরস্বরে কাণে বাজিতে লাগিল—"বল সে মুক্তা কোথায়?" দ্বিপ্রহরে স্বাম অন্তঃপুরে আসিলেন না। আমি আশা করিয়াছিলাম, অন্ততঃ আর একবার জিজ্ঞাসা করিতে আসিবেন। মূঢ় আমি তখনও বুঝিতে পারি নাই যে মুক্তা হারাইবার পাপ বাক্যে সংশোধিত হইবার নয়। সকল কথা খুলিয়া বলিব, সত্য কথা ববিলে স্বামীর দয়া হইবে—মনে করিয়া সন্ধ্যার পর স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। স্বামী আসিলেন, কিন্তু যে ভাবে আসিলেন, তাহা অপেক্ষা না আসিলে ভাল ছিল। তাঁহার বক্ষের উপর সংবদ্ধ বাহুযুগল ও কঠিন দৃষ্টি দেখিয়া আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, কথা সরিল না। আমাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী কহি-

লেন, "সত্য বল, সে মুক্তাটি কোথায় ?" আমি অনেক চেষ্টার পর শুষ্ক-কণ্ঠে কহিলাম, "হারাইয়া গিয়াছে।" স্বামী কহিলেন, "আমার বিশ্বাস, সেই সঙ্গে তোমার পবিত্রতাও হারাইয়াছ, তাহা না হইলে এ কথা বলিতে আমার নিকট দ্বিধা করিতে না ; আমার সকল গর্ব্ব, সকল আনন্দ, সকল সুখ ও শান্তি, আমার সমস্ত জীবনের গৌরব তোমাতে নিহিত ছিল, তুমি সব নষ্ট করিয়াছ।" স্বামীকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া কহিলাম, "ওগো শোনো, কি করিয়া হারাই-লাম, সকল কথা খুলিয়া বলিলে তুমি বুঝিবে, আমি অবিশ্বাসিনী নই, তুমি নিশ্চয় ক্ষমা করিবে।" স্বামী পূর্ব্ববৎ কঠিন স্বরে কহিলেন, "আমি ক্ষমা করিতে পারি—করিব—কিন্তু প্রথম গোপন করিয়া যে অবিশ্বাস অর্জ্জন করিয়াছ, এখন তাহার ক্ষালন হইবে কিসে ? যত দিন মুক্তা পুন-রুদ্ধার করিতে না পার, ততদিন তুমি আমার ত্যজ্যা।"

স্বামী চলিয়া গেলেন। তাঁহার কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া শতবৃশ্চিকের ন্যায় আমাকে দংশন করিতে লাগিল। তাঁহার অন্তরের গভীর বেদনা অনুভব করিয়া হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল। আমি বুঝিলাম, স্বামীর মনে আমার কি স্থান ছিল, তিনি আমাকে কি স্বর্গরাজ্যের অধিকারিণী করিয়া-ছিলেন! হায়! হতভাগিনী কিসের জন্য সব হারাইলাম। সেই দিন হইতে নানা স্থানে লোক পাঠাইলাম—যেখানে যত জহুরী ছিল, সকলের নিকট অনুসন্ধান করিলাম—দেশ বিদেশে কতই খুঁজিলাম, সেরূপ নিষ্ক-লঙ্ক শুভ্র মতি কেহ আনিয়া দিতে পারিল না। অদৃষ্টের এমনই বিড়-ম্বনা, কোনও মতি সে শূন্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল না। আশায় আশায় বহুদিন কাটিল। ভাবিলাম, জীবন পণ রাখিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বসিয়াছি, যদি দেবতা করুণা করেন, যদি সহসা মুক্তাটি খুঁজিয়া পাই—কিন্তু বুঝিলাম, আপনার কর্ম্মফল খণ্ডন করিবার অধিকার দেবতারও নাই। স্বামী আর আমাকে গ্রহণ করিলেন না ; তাঁহার প্রাসাদে,—প্রকাশ্যে তাঁহার সকল সম্পত্তির অধিকারিণী থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হইয়া—আমি নরকবাস করিতে লাগিলাম। দেবতার এই এক অনুগ্রহ দেখিলাম, অধিকদিন সে দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতে হইল না। মৃত্যুর পূর্ব্বে স্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলাম। স্বামী আসিলেন ; দেখিলাম, সে দেহকান্তি, সে জ্যোতিঃ, সে আনন্দোৎফুল্ল মুখ বিবর্ণ হইয়াছে। আমার

দিকে চাহিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় সজল হইল। আমি কাতরে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া কহিলাম, "আশীর্ব্বাদ কর, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকেই স্বামী পাই।" স্বামী অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষমা তোমাকে বহুপূর্ব্বে করিয়াছি; তুমি ইহলোকেই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছ—যে দিন প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে, সে দিন আবার আমাকে পাইবে, আমি তোমার অপেক্ষায় থাকিব। কিন্তু মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট না হইলে তোমার মুক্তি নাই।"

বুঝিলাম, ত্যাগ করিলেও, আমার প্রতি যে গভীর ভালবাসা স্বামীর অন্তরে ছিল, তাহার এক কণাও লোপ পায় নাই। সেই গৌরব লইয়া মরিয়া ধন্য হইলাম, কিন্তু মৃত্যুর পর পারেও শান্তি পাইলাম না। বুঝিলাম আত্মপাপ নিজের মুখে প্রকাশ না করিলে প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে না। তাই যে দিনই এ বংশের নববধূ সেই মুক্তার মালা কণ্ঠে ধারণ করে, আমার আত্মকাহিনী শুনাইতে এবং সেই নষ্ট মুক্তাটির সন্ধান করিতে আসিতে হয়। তোমার নিকট সব স্বীকার করিলাম। এখন আশায় থাকিব, মুক্তা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে আবার স্বামী সহ মিলিত হইব। সেই মিলনের তৃষ্ণায় নিশিদিন অস্থির হইয়া ফিরিতেছি—না জানি আরও কতকাল এই ভাবে কাটিবে।"

আমি কহিলাম, "মা! তোমার আশীর্ব্বাদে যেমন করিয়া পারি, মুক্তা সংগ্রহ করিব—তোমার প্রায়শ্চিত্ত আজ পূর্ণ হইয়াছে, এখন স্বামী সহ মিলিত হইয়া ধন্য হও—এ বংশে তোমার কাহিনী ব্যর্থ না হইয়া কল্যাণের উৎসস্বরূপ হউক।" দেখিতে দেখিতে রাণী নর্ম্মার ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গেল—তাঁহার মুখের প্রসন্ন ভাব ও আনন্দের জ্যোতিটুকু দেখিয়া বুঝিলাম, আত্মদোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইয়াছে। সেই দিন হইতে সংকল্প করিয়া, অনেক দিনের চেষ্টায়, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মুক্তাটি সংগ্রহ করিয়া শূন্য পূর্ণ করিয়াছি।

নববধূ গৌরী দীপালোকে অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় মুক্তাটি ভাল করিয়া দেখিয়া, শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আশীর্ব্বাদ কর মা! এ রত্ন যেন না হারাই।"

শ্রীঅমলা দেবী।